বারান্দা ও অন্যান্য

বারান্দা ও অন্যান্য

পরিবেশক
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১ অক্টোবর ১৯৫৪

প্রকাশক

অরুণ ঠাকুর

গীতা প্রকাশনী

৫৪/১ সি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০০৪

মুদ্রাকর

জি. আর. টি. প্রিণ্টার্স

৫৪/১ সি শ্যামপুকুর স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০০৪

প্রচ্ছদপট ঃ

শংকর দাস

সূচীপত্র

পরমায়ু

কুঞ্জ মাঝির চক্ষু দু'টি গেল। পুরোপুরি নয়। রোদ থাকলে চোখে একটা লালচে আভা ঠাহর হয়। মানুষজনের চেহারার আদলটুকুও ধরতে পারে।

—'কে গেলি? নারাণ? উঠে আয় দিকি একবার!'

—'সুবুচনীর মা নাকি গো? বউমার কাছে এয়েচ? বেশ বেশ।'

এই পর্যন্ত। সম্পন্ন চাষী। ঘরে চিঁড়ে, মুড়ি, সরষের খোল অপর্যাপ্ত। চিকিৎসার ত্রুটি হতে দেয়নি ছেলে। সদরে যেতে হলে নদী পার। সেভাবেই একে একে দু'টি চোখেরই ছানি অস্ত্র হল। প্রথমে কালো ঠুলি, তারপর বেশি পাওয়ারের চশমা উঠল নাকে। কালো ডাঁটির। চলল ওইভাবে বছর ছয়েক। তারপর ধীরে ধীরে আবার সব আবছা হচ্ছে। দিনের বেলাতেই যেন মনে হয় সাঁঝ নেমে গেছে। ভুরুর ওপর হাত দিয়ে মানুষ ঠাহর করতে করতে সে বলে, —'কইরে রানি, বিমলি! গেলি কই? পিদ্দিম দিলি নে যে বড়!'

—'পিদ্দিম দোব যে পাখপাখালির ডাক শুনতে পেয়েছো? বলি অ ঠাকুদ্দা!'

—'তা পাইনি', ডিমের মত চুকচুকে হয়ে আসা মাথাটি নাড়তে নাড়তে কুঞ্জ বলে। রান্নাশালের পেছন দিক থেকেই আরম্ভ হয়েছে তার ন কাঠা সাত ছটাকের বাগান। সন্ধের ছায়া নামলেই তার আম জাম জামরুল পেয়ারা গাছ সব ঘর-ফিরতি পাখির প্রচণ্ড কলরোলে ঝমঝম করতে থাকে। তা সেও যেন আজকাল রূপনারাণ, কংসাবতী, মুণ্ডেশ্বরীর জল পার হয়ে তার তীব্রতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলে তবে আসছে কুঞ্জ মাঝির ভোঁ লাগা কানে। কান দু'টি তার আগে-ভাগেই গেছে। মেয়ের ঘরের নাতি সুজন বেশ লেখাপড়া করেছে, সে বলে ইস্টোন ডেফ।

যে ডাক্তার ছানি অস্তর করেছিল সেই দেখল আবার, দেখে-টেখে হাতের যন্তর নামিয়ে বলল —'চোখের নার্ভ সব শুকিয়ে গেছে তোমার বাবার। জরায়, বার্ধক্যে, বুঝলে কিছু?'

—'এজ্ঞে, তার কোন চিকিচ্ছে বার হয়নি।' পঞ্চাননের ভাবটা যেন চিকিচ্ছে বার হয়ে থাকলে সে তার বাপকে জেনিভা-টেনিভা পাঠাবে।

ডাক্তার বললে —'না। বার হয়নি। নার্ভগুলির পরমায়ু ফুরিয়ে গেছে। আর পঁচানব্বুই তো পার করল তোমার বাবা, অনেক তো দেখলও। দেখবে যে, এখন আর দেখবার আছেটাই বা কী! যেদিকে তাকাও খালি দুঃখ, দুর্দশা, দুর্নীতি।'

পঞ্চা বিড় বিড় করে বলে —'দেখতে চাচ্ছে যে! বড্ডই দেখতে চাচ্ছে ডাক্তারবাবু। বুঝেন না কেন, হাত বুইলে বুইলে মুখের চামড়াগুলো আমার তুলে নিচ্ছে বুড়ো।'

—'পঞ্চা! পঞ্চা! তুই পঞ্চুই তো রে!'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমার সন্দ হচ্ছে কেন আজকাল?'

—'কানে শুনিনে বাবা। তোর ছেঁয়াটা গলা ভারী করে আমার ঠেঁয়ে টাকা পয়সা নিয়ে যায়। আজ এক কুড়ি, কাল দু'কুড়ি.....'

—'ভোলো কেন? তার মুখ বুলোও?'

—'বুলুই তো!'

—'আমার যে খাটা-খোটা ফাটা বুড়োটে চামড়া, আর তারটা যে মিহিন টের পাও না?'

কুঞ্জ এইবার রেগে ওঠে।

—'তুই কতো বড়োটা হলি যে বুড়োটে চাম হবে? শুখো চাম তোর শত্তুরের হোক।'

এত দুঃখেও হাসি আসে পঞ্চাননের। যে বাপের পঁচানব্বুই পার হতে যায় তার ছেলের চামড়া এখনও কিশোর ছেলের মতো হবে? আবদার মন্দ নয়।

পঞ্চানন ঠাকুরের দোর ধরা ছেলে। চারটি পর পর নষ্ট হয়ে অনেক কষ্টের ওই একটিই ছেলে কুঞ্জর। পাঁচ পাঁচ খানি ধুমসো ধুমসো মেয়ের পরে। মড়ুঞ্চে পোয়াতি বলে সে সময়ে পঞ্চুর মার কী অচ্ছেদাটাই না হয়েছিল! চাঁদপানা মুখ দেখে বিয়ে দেওয়া; সেই বউ যদি পাঁচ ছ বছরেও গর্ভ না ধরে কি মরা ছেলের জন্ম দেয় তো তার খোয়ার কুঞ্জ কেন ধম্মোঠাকুরের বাবা এলেও আটকাতে পারবে না। তারপর যদি বা হল, হতেই থাকল। ধুমবো ধুমবো মেয়ে সব। একটু একটু করে বড় হয় আর গাছ কোমর বেঁধে নাকে নোলক, কপালে টিপ কই

মাগুরের মত খলবলিয়ে খেলে বেড়ায়। কতখানি বয়েস পর্যন্ত কুঞ্জ মাঝির একার হাতে জমি, জিরেত, ক্ষেত, খামার, হেলে-বলদ, গাই-গরু। চারটে-পাঁচটা মুনিষ দিন রাত হাঁ-হাঁ করছে। মুরুক্ষু সুরুক্ষু মানুষ খাটুনির ভাগটুকু না হয় সামলাল, কিন্তু ধরিত্তির মা যে তুষ্ট হয়ে সোনা তুলে দিচ্ছেন হাতে তার হিসেব পত্তর সে রাখে কী করে? কোমরের গেঁজেতে পয়সাকড়িগুলো তার শুধু ঠুসে রাখাই সার। চালানের অভাবে কত আনাজপাতি তার ফি বছর নষ্টই হতে থাকত। এখন দেখো কেমন সব গোনা-গাঁথা। লাল খেরোর খাতা, কানে কলম, কড়া-ক্রান্তি হিসেব ছেলের, এক কানি এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

কুঞ্জ মাঝির শব্দহীন বর্ণহীন ভুতুড়ে জগতে পঞ্চুই একমাত্র মানুষ। মানুষটি মাঝে মাঝে তার মানসপটে দেবতাই হয়ে ওঠে। এক জমির থেকে তিন তিনটি ফসল অবলীলায় ওঠায় যে, ভ্যানগাড়ি কিনে বাগানের ফুল-ফুলুরি নিজ হাতে চালান দিয়ে মুঠো মুঠো টাকা আনে আর বাপের গেঁজে ভর্তি করে যে, সে ছেলে দেবতা নয় তো আর কী! কোমর ভর্তি টাকা, তা হোক না কোমর ভাঙা, চৌদিকে এমন টাল হয়ে থাকা সবুজ, না-ই বা চোখে দেখল এত সুখ শরীরে সইলে হয়! দুগগোপুর থেকে জল ছাড়লে দাওয়ায় উঠে আসে, সত্যি কথা। কদিন নৌকোর ওপর দোল-দোল দুলুনি। গরমেন্টোর রিলিফ সরকার এসে বলে গেল —'আপনারা এ গ্রাম ছাড়ুন, এসব জল-নিকেশী জায়গা। আমাদের কিচ্ছু করবার নেই।' পঞ্চা গাঁয়ের পাঁচজনকে একত্তর করে বোঝাল, নিজের হাতে গড়া ভুঁই কেউ ছাড়ে?

এখন গরমের দিনে বউমা ঘন দুধের মধ্যে বাড়ির ভাজা ডবকা ডবকা মুড়ির ধামি উপুড় করে দেয়, তাতে কলমের আমের ঘন রস, গন্ধে নীল ডুমো মাছি ওড়ে। দুই নাতনি দু'দিক থেকে ঝাপটে ঝাপটে বাতাস করে। গ্রাস মুখে তুলে কুঞ্জ মাঝি হাপুস-হুপুস মা লক্ষ্মীর পেসাদ পায় যেন। লক্ষ্মী তো নয় গণেশ। সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুরটি তার মানুষের রূপ ধরে দাওয়ায় পায়ের খসখস শব্দ তুলে উঠে আসে, গামছা ঝাড়ে, বলে —'কী গো বাবা? খাচ্ছো ক্ষীর-মুড়ি? খাও, খাও বেশ করে খাও।'

রানি, বিমলা দু'ধার থেকে খিলখিল করতে থাকে।

—'হাসির কী হল? বলি, হাসির কী হল রে ছুঁড়ি? হ্যাঁ গো বাবাকে জামরুল দিলে না যে বড়! অমন ডাঁশা ডাঁশা জামরুল, চুবড়ি ভর্তি সব সাজানো রইল যে!'

মাথায় ঘোমটা, রানি বিমলার মা বেরিয়ে এসে বলে 'তারপর পেট কামড়ালে?'

—'অবাক করলে, দাঁতে একটা ফুটো নেই, ফাটা নেই, বাটি বাটি ক্ষীর সাবড়ে দিচ্ছে, জামরুল খেলে পেট কামড়াবে? ছিটেলের ঘরের মেয়ে দেখছি?'

হিঙেলের বাটি ভর্তি জামরুল এনে বউ বসিয়ে দিয়ে যায়।

—'এক ছিটে জল দে রে রানি। মুখ কুলকুচি করি। নইলে মিষ্টি মুখে জামরুলের সোয়াদ পাবোনি।'

কুলকুচি করে ঢকঢক গেলাস খানেক জল খেয়ে কুঞ্জ জামরুলের গায়ে হাত বুলোয়। আহা কী চিকন গো, এই নাতিনদের মুখের মতো। কামড় দিলেই রসের ফোয়ারা ছুটবে। তার দাঁতগুলি সব অটুট। দু-চারটি কষ ছাড়া ওই সব একেবারে যাকে বলে একেবারে বিদ্যমান। সারা জীবন দাঁত দিয়ে আখ ছুলে চিবিয়ে খেয়েছে, মাংসের হাড় চিবিয়ে ধুলোগুঁড়ি করে দিয়েছে সে কি অমনি, অমনি! দাঁতের বাহার দেখলে এই বয়সেও লোকের চোখ ঠিকরে যাবে। চোখ দুটি আর কান দুটি যে কেন গেল? সেই সঙ্গে শালোর কোমর, তা কুঞ্জ আজও বুঝতে পারে না। আরও একটি জিনিস বোধের অগম্য তার। কার্তিক পড়তে না পড়তেই জাড় অমন জেঁকে বসে কেন? পোষ-মাঘে সে রেজাই গায়ে দিয়ে ঘরে আংরা রেখেও শীতে ঠকঠক করে কেঁপে সারা হয়। জামা-কাপড়-শয্যে সব যেন জলে চুবিয়ে এনেছে। অথচ এই সিদিনের কথা, অঘ্রাণমাসের সন্ধেবেলায় মাঠের কাজ সেরে সে গাঙে ডুব দিয়ে এসেছে। নাতি এক বাঁদুরে টুপি এনে দেয় শহর থেকে। সেইটে পরে এখন জাড় খানিকটা সামলে-সুমলে আছে। এছাড়াও হচ্ছে তলপেটে একটা খামচানি ব্যথা। ডাক্তার বললে এ রোগকে বলে হার্নি। অস্ত্র করতে হবে। 'অস্তর! আবার অস্তর!' হাঁউ মাউ করে উঠেছিল সে, 'চোখের ওপর ছুরি চালিয়ে তো তার দফা নিকেশ করে দিলে, এবার পেটে ছুরি বসিয়ে আমারই কম্মো কাবার করতে চাও নাকি গো, ডাক্তারবাবু!'

ডাক্তার হেসে বলেছিলেন, —'কম্মো কাবার হবে না। কিন্তু যদি হয়ই, তো কি খুড়ো? অনেক দিন তো জীবনটা চেখে চেখে বাঁচলে। আর এই ঘিনঘিনে ব্যথা নিয়ে বাঁচতে ভাল লাগবে?'

কুঞ্জ অর্ধেক কথা শুনতে পায় না। এগুলি ঠিক শুনেছে। পঞ্চুকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকে, বলে —'পঞ্চু আমাকে খবরদার টেবিলে তুলবিনি। বাড়ি নিয়ে চ। ঘিনঘিনে ব্যথা সে আমার, আমি বুঝব, ও শালোর ডাক্তারকে বুঝতে হবেনি।'

পঞ্চু হাসে, —'জোর করে কে তোমাকে টেবিলে তুলছে?'

ডাক্তারের পরামর্শমত নীচ-পেটে পরবার বেল্টো কিনে দিয়েছে পঞ্চু, ঘুমের

সময় আর প্রাতঃকৃত্যের সময় ছাড়া পেট সাপটে থাকে। এই তো সবেরই সুসার আছে, শুধু শুধু ছুরি-কাঁচি ইসব কী? শরীর থাকলেই রোগ-বালাই। তা যেমন রোগ তার তেমন ওষুদ! ঘাবড়ালে চলে? বুনো ওলের জন্যে চাই বাঘা তেঁতুল, নয় কী?

দুপুরবেলা দুই নাতিন বেশ করে তেল ডলে দেয়। পিঠটা বড্ড রুখু হয়ে যাচ্ছে। কুঞ্জ পিঠে তেল থাবড়ে দেয় হাত বেঁকিয়ে। পঞ্চুর বউ রাঁধে ভাল, তাকে বলে —'পুঁইডগা আর লাউ দিয়ে চিংড়িমাছ অনেক দিন রাঁধো না তো বউমা। বেশ চনকো চনকো চিংড়ি।'

বউ বলে —'চিংড়ি কই! পোকা মারার ওষুদে চিংড়ি হবার উপায় আছে?'

—'গুগলির ঝোল সে-ও তো অনেক দিন খাওয়াওনি; খেলে পরমাই বাড়ে তা জানো?'

রানি-বিমলা হাসির বেগ সামলাতে পারে না। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। রানি কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে —'কার পরমাই বাড়ার দরকার পড়ল গো অ ঠাকুর্দা?'

—'কেন রে ছুঁড়ি? তোর, তোর বাপের, মায়ের, আমার...'

—'ওইটেই আসল কথা। তোমার পরমাইটাই আরও একটু নাম্বা করা দরকার।' রানির মা চোখ রাঙিয়ে তাকায়। তাদের বাবা ঠাকুর্দার সঙ্গে এ ধরনের তামাশা পছন্দ করে না। বলে, 'জানিস আমি বাবার কত বয়সের ছ্যালা। ও তো আমারই ঠাকুর্দার মতন।'

কুঞ্জ তেল-টেল মেখে আবার বলে —'আজকাল কি ছাতু আর হচ্ছে না বউমা! প্যাঁজ, রশুন, নংকা দিয়ে বেশ করে একদিন ছাতু রাঁধো তো! তোমার শাউড়ি রাঁধত। এক থাবা ছাতু দিয়ে এক থালা ভাত উঠে যেত।'

রানির মা বিরক্ত হয়ে সামনে থেকে সরে যায়। তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, কোথায় ধম্মোকথা কইবে তা না পুঁই-চিংড়ি, গুগলির ঝোল, ছাতু। ঘোর কলি একেই বলে! বুড়ো মানুষের মনেও ধম্মো নেই।

পঞ্চানন বুঝদার মানুষ। সে স্ত্রীকে বোঝায় —'বুঝো না কেন বউ। চোখ নাই, কান নাই যার, তার পরানের সবটুকখানিই যে জিবে এসে ঠেকেছে গো এর সঙ্গে ধম্মো অধম্মোর সম্পক্ক কি? কুঞ্জমাঝি কোনওদিন অধম্মো করে নাই। বুড়ো বয়সে নাই বা ভেক নিল।'

বউ গজগজ করে, স্পষ্টই বোঝা যায়, ধর্ম-অধর্মের ধারণায় সে তার স্বামীর মতে মত দিতে পাচ্ছে না। সে অসন্তুষ্ট গলায় বলে, —'যত অনাছিস্টি কাণ্ড!'

ফাগুন চোতে আকাশ যেন রক্ত-পলাশ! কাছে ভিতে জঙ্গল, বাগান, চরের মাটি, নদীর পাড়, এমন কি মেঠো হেটো রাস্তার দু'ধার অবধি সবুজে সবুজ! ন্যাড়া গাছের ডালে ডালে দ্যাখ-না-দ্যাখ কচি পাতা তিড়িং বিড়িং নেচে নেচে বার হয়ে যাচ্ছে। দুই বোনের এক লগ্নে বিয়ে দিয়ে সারল পঞ্চানন। বলল —'বাবা, তোমার একটুকখানি খালি খালি লাগবে। তোমার বউমার তো শতেক কাজ! তার মাঝে তোমার নাতিনদের মতো হাতে-হাতে মুখে মুখে তো বেচারি পারবে না! একটু বুঝো!'

যার বলবার কথা সে বলল। এখন যার শোনবার কথা সে তো শোনেওনি। এমন দিনে রানি-বিমলা দুই বোন ঠাকুর্দাদার দুইপাশ থেকে পাকা চুল তোলবার ভান করত 'ও মা, মা, ঠাকুর্দা, কোথায় যাব গো! তোমার যে কাঁচা কালো চুল উঠছে গো.' খুশি হয়ে উঠত কুঞ্জ, অবাক নয় কোনমতেই। এটাই যেন স্বাভাবিক।

—'কটা? কটা? গুনে দেখ তো দিদি!'

—'একটা ছিঁড়ে তোমায় দেখাব?'

—'উঁ হুঁ হুঁ — প্রবল প্রতিবাদ তুলত কুঞ্জ, 'পাঁচ কুড়ি পুন্ন হলে নতুন পাতার মতো নতুন চুলও গজায় রে, শরীল নতুন হয়ে ওঠে। দেখছিস না গাছপালায় সব পাতাপুতি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে!'

—'তুমি দেখতে পাচ্ছ?'

—'তা এক রকম পাচ্চি বইকি! বলরামচুড়োয় কেমন কালচে সবুজ পাতার টুপি এসেছে। মানুষেরও অমনি হয়!'

হাসি চেপে রানি বলত —'তাহলে ঠাকুর্দা তোমার চোখ-কানও আবার হবে?'

—'হবেই তো' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় কুঞ্জর, 'আবার কোমর সোজা করে দাঁইড়ে লাঙল ধরবুনি? ছোঁয়াটা তো সদরে দোকান দিচ্ছে, না পয়সা জলে দিচ্ছে। পঞ্চার পাশে কে দাঁড়ায় দিদি! পঞ্চাটা আমার খেটে খেটে হেলে গেল।'

হেলে কিন্তু পঞ্চানন যায়নি। চোত মাসের সকাল ন'টা থেকেই কাঠ ফাটে। ভাঁটরোর গ্রামাঞ্চলটুকু সবুজে সবুজ, তবু একটুখানি ছায়া ছায়া। কিন্তু ভ্যানগাড়ি নিয়ে বাজার হাটে বেসাতি করতে গেলে নৌকোয় নদী পেরিয়ে আগে পড়বে মাঠ। তাতে আদিগন্ত কোথাও জিরেন নেই, বাস রাস্তায় একবার ঠেলে উঠতে পারলে ভ্যানগাড়ি শনশনাশন চলবে, তখন কোনও বড়সড় গাছের ছায়ায় দুদণ্ড গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেয়ে নেওয়াও যেতে পারে। পঞ্চার গাড়িতে কাঁচকলার কাঁদি, কাঁটালি কলা, এঁচোড়, থোড়, পাকা পেঁপে, কাঁচা পেঁপে, সজনে ডাঁটা, বেগুন. লঙ্কা. নেব! সব কুঞ্জর বাগানের।

সন্ধ্যে ঘুরে গেল। তুলসীতলার পিদিমটি নিবু-নিবু। অন্ধকার ঘোর হচ্ছে। আনাচে কানাচে ঝিঁঝির প্রবল প্রতিপত্তিতে ঝিনিঝিনি খস্তাল বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। কুঞ্জ বলল—'পঞ্চা যে এখনও এল না বউমা!' ছেলে বাড়ি না থাকলেই সে সন্ধ্যে থেকেই কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঘর বার করে।

বউ বললে —'বেরুতে একটু বেলা তো হল, মাংসটা কাটল, কুটল, রাঁধল, তবে না বেরুনো। গাড়ি চুড়ো করে আনাজপাতি নিয়ে গেছে বাবা। ভাঙা হাট অবধি না দেখে কি আর সে আসছে! তুমি খেয়ে নাও।'

—'খাব কী গো? ছেঁয়াটা আসুক।'

—'সে যদি আসে এখন তেতপ্পরে। চান না করে ভাতেও বসবে না। তুমি বুড়ো মানুষ। এখনই তো ঢুলছ দেখছি, ...'

—'তালে দিয়েই দাও। মাংসটা আছে তো?'

মুখ টিপে হেসে বউ বলে, —'আছে গো আছে, আর কারুর না থাক তোমার আছে। তা চোতের গরমে দু'বেলা মাংস, খাবে তো?'

—'চোতের গরম? কোথায়? সাঁঝ হতে না হতেই তোমার চোত পালিয়েছে, ফুরফুর করে গাঙের হাওয়া দিচ্ছে এমন!'

দাওয়ায় পাতা করে বুড়োকে এনে গুছিয়ে বসিয়ে দিয়ে যায় বউ। কাঁসার বড় বাটিতে মাংস। আজ অনেক দিন পর গাঁয়ে খাসি কাটা হল, পঞ্চা তার নিজের ভাগ পাতা মুড়ে নিয়ে এসে নিজেই টুকরো টুকরো করেছে, নিজেই রেঁধেছে, কষে ঝাল দিয়ে। খেতে খেতে ঝালে টকাটক আওয়াজ তোলে কুঞ্জ। চোখ দিয়ে জল পড়ে। কিন্তু সোয়াদ কী? মুখ যেন ছেড়ে গেল।

ভাত-টাত ঝোল মেখে শেষ করে সবে দাঁত বসিয়েছে একখানা হাড়ের ওপর জুত করে, বাইরে লোকজনের আওয়াজ পাওয়া গেল। লণ্ঠন তুলে বউ সদরে আলো দেখায়। চার পাঁচজন জোয়ান লোক ভ্যানগাড়ি থেকে পঞ্চাকে নামিয়ে দাওয়ায় রাখলে। মাঠের মধ্যেই নাকি ভ্যানগাড়ি থেকে উলটে পড়েছিল। হাট-ফিরতি লোক দেখতে পেয়ে তক্ষুনি আবার হাসপাতালে নিয়ে গেছে, ডাক্তার দেখে বলেছে—ইস্টেরোক। হাসপাতালে ভর্তি করার জায়গা নেই। ওষুধ পত্র দিয়ে, ছুঁচ ফুঁড়ে, যা করবার করে ছেড়ে দিয়েছে। এখন কী কী খাওয়াতে হবে না হবে গোপাল কর্মকার পঞ্চার বউকে সব বুঝিয়ে বলছে।

হাড়টা এতক্ষণে ভাল করে ভাঙতে পেরে গেছে কুঞ্জ। ভেতরের রসটুকু জিভ সরু করে চুষতে চুষতে বলছে —'পঞ্চা এলি? সঙ্গে কে র‍্যা। নিধু নাকি? শালো খচ্চর তুমি খাসির রাঙের লোভে লোভে কুঞ্জ মাঝির ঘরে রাত দুপুরে

সেঁদিয়েছ। তোমায় আমি চিনি নে?'

নিধু বললে —'খুড়োকে আর ভেঙে কাজ নেই।'

গোপাল বললে —'রাখ,রাখ, সেঞ্চুরি করতে যাচ্ছে, এখন আর হ্যান নেই ত্যান নেই ছাড়। বল বুড়োকে? হাড় ছেড়ে উঠুক। পঞ্চাদার অবস্থা একদম ভাল নয়। দেখলি না চোখের পাতা টেনে টর্চ মেরেই ডাক্তার ছেড়ে দিল। রাত কাটবে না। সুজন, পরাণ সব খবর দে।'

ভোর রাতের দিকে পঞ্চানন অজ্ঞাত লোকে যাত্রা করল। বেচারির জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। সরু-মোটা গলার হাহাকারে গগন ফাটছে। কুঞ্জবুড়ো দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে রয়েছে। সারা দিন একই ভাব। পাড়া ভেঙে সান্ত্বনা দিতে এল সব। মেয়েরা পড়েছে কুঞ্জর বউকে নিয়ে। বুড়োরা পড়েছে কুঞ্জকে নিয়ে। মাধব ঠাকুর পুরুতও বটে, জ্যোতিষীও বটে, বললে —'মুখ তোলো কুঞ্জ, কোমর সোজা করে তোমাকেই তো এখন দাঁড়াতে হবে গো!' কুঞ্জ কোনওমতে দুই ঠ্যাঙের মধ্যবর্তী গহ্বর থেকে ডিমের মতো মাথাটি তুলে বলে—'হাত পা আমার পাতা-পাতা হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর, বুকের মধ্যেটা ঘোর যনতন্না, শরীলটা আর বশে নেই গো!

—'আহা, অমন জলজ্যান্ত ছেলেটা ঠিক দুককুরে.... গেল, শরীর আর বশে থাকে কুঞ্জ! তবে ছেলে তোমার দুপোয়া দোষ পেয়েছে। বিহিত করো, নইলে বাড়িতে আরও কটা অমঙ্গল অপঘাত কেউ আটকাতে পারবে না।'

বিকেল নাগাদ মড়া-পোড়ানিরা সব ফিরে এল। মটর ডাল দাঁতে কেটে, নিম ছুঁয়ে, আগুন ছুঁয়ে যে যার মতো ঘরে গেল। পঞ্চুর ঘরে বাতি জ্বলছে। বউ মেঝে আঁকড়ে শুয়ে। মাথার কাছে মেয়ে দুটি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুজন পরাণ দুই নাতি অনেক রাতে খুটখুট শব্দ পেয়ে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শোকাতাপা শরীর, ঘুম তো সহজে আসে না। যদি বা আসে একটু আওয়াজেই খান খান হয়ে যায়। পরাণের ওপর আবার নতুন দায়-দায়িত্বের দুর্ভাবনা। চাষ-বাসের বিশেষ কিছুই সে জানে না। তা বলে খুটখুট শব্দ এরই মধ্যে? চোর-ডাকাত সব বোধহয় জেনে গেছে, এখন থাকার মধ্যে এক অথর্ব বৃদ্ধ, এক সন্তপ্ত বিধবা আর এক উঠতি বয়সের অকাল কুষ্মাণ্ড যে নাকি বাপ-পিতেমোর ধারাও নেবে না, অন্য ধারা নিতে গিয়েও খালি মার খাবে। কুঞ্জমাঝির ভাষায় 'ছেঁয়া।'

দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে আসে, লোহার ডাণ্ডা থাকে ঘরের কোণে, সেটাকে হাতে তুলে নেয় পরাণ। খুটখাট আসছে দক্ষিণের দাওয়া থেকে। কুঞ্জর ঘরেই যতেক কাঁচা টাকা। নজর ওদিকেই হবে। দাওয়া ঘুরে পেছনে

যেতেই দেখল চাঁদ চালের বাতা ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে। দাওয়া ফর্সা। ঠাকুর্দাদার ঘরের চৌকাঠে চোর হামাগুড়ি দিচ্ছে, তার বেঢপ ছায়া পড়েছে দাওয়ার ওপর।

—'তবে রে!' বিকট হাঁকড়ে উঠল সুজন।

চোরের কানে শব্দ পৌঁছেছে ঠিক। কিন্তু যতটা জোর হাঁক ততটা জোরে নয়। হাত থেকে ঠক করে কী যেন দাওয়ায় পড়ে গেল।

সুজন-পরাণ নিচু হয়ে বলল-- 'একি! কী করছ গো ঠাকুদ্দা, এই দুপুর রেতে!'

ফ্যালফেলে দৃষ্টি মাঝির দৃষ্টিহীন চোখে। ধরা পড়ার গলায় বলল — 'এই যে দাদা দু'টো ঘোড়ার নাল, বেশ কালো কালো ক্ষয়াটে! ঠাকুরমশাই বলে গেল কিনা তোর বাপ দোষ পেয়েচে, দিষ্টি পড়বে, তাই দোরে নাল দু'টো বাবলার আটা দে সেঁটে দিচ্ছিলুম।'

তর্করত্নপাড়ার পুজো

মহাসপ্তমীর দিন ন'টা একুশের লোকালে কয়েকটি ছেলেমেয়ের একটি দল একটা অখ্যাত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে নামল। একখানা বেঞ্চি কোনমতে খাড়া আছে, ফেরিওলার হাঁক মিয়োনো, স্টেশন চত্বরে কোন ভিড় নেই এই পুজোর বাজারেও। দলের মধ্যে একটি ছেলে যেমন লম্বা তেমন মোটা। অপরজন বেশ ব্যায়ামবীর-ব্যায়ামবীর। ব্যায়ামবীর মোটার দিকে তাকিয়ে বলল —'চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখ ঠিক জায়গাতেই নেমেছি মনে হচ্ছে রে লম্বু, কী বল শিবানীদি?' এরা শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণী। এদের ফটোগ্রাফি, গৃহসজ্জা, ফ্যাশন, ছবি-আঁকা, গান-বাজনা ইত্যাদি সব বিষয়েই অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে, পড়াশোনার ডিগ্রি ছাড়াও। কিন্তু তিনবছর চেষ্টা করেও কেউ একটা মনোমত চাকরি জোগাড় করতে পারে নি। তাই ওরা জোট বেঁধেছে। নিজেদের অন্ন নিজেরাই জুটিয়ে নেবে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা-চওড়া মেয়েটি টিকেট-কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করল —'আচ্ছা, এখানে পুজো হচ্ছে কোথায় বলতে পারেন?'

—'পুজো?' বুকিং ক্লার্ক মশাই চশমার ওপর দিয়ে চেয়ে বললেন —'কোথায়? না কোথায় কোথায়? হিসেব দেওয়ার সাধ্যি আমার নেই মা।'

পেছন থেকে একটি রিকশাঅলা হেঁকে বলল —'আসুন না দাদা-দিদিরা, আমি সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। দুটো রিকশয় তিরিশটা টাকা লাগবে কিন্তু।'

মেয়েটি বাকি সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল —'চল, সেটাই ভাল।'

অবিলম্বে দুটো রিকশা এসে গেল। একটাতে বসেছে তিনটি মেয়ে। বড়সড়টি মাঝখানে। অন্যদুটি ছোটখাটো। তারা দু'পাশে। হুড নামানো সীটের দু'ধারে।

ছেলেদুটি আরেকটি রিকশয়। নোদলগোদল লম্বু রিকশার তিনভাগ জুড়ে একাই। বাকি জায়গাটাতে কোনমতে বসে ব্যায়ামবীর বলল —'বাপ্‌স রে, বসা তো হল কোনমতে। এখন এই খোঁদল থেকে নামতে পারলে হয়। লম্বু তুই ডায়েট কর।'

লম্বু বলল —'জীবনের চার্মটাই যে তাহলে চলে যাবে রে!'

দু'চারটি ঠাকুর দেখতে দেখতেই কিন্তু ওরা সব্বাই হই হই করে উঠল। —'আরে এতো আখচার দেখছি! এর মধ্যে নতুনত্ব কই? সেই কয়েকটা পুতুল বসানো আছে। মাথার ওপরে কাপড়ের চিত্তির-বিচিত্তির, লাউড-স্পীকারে লেটেস্ট ফিলমি গান। 'ধুর, আমরা পিওর গ্রামের পুজো দেখতে চাই ভাই। ও রিকশাওয়ালা!'

রিকশাওয়ালা বসন্ত বলল —'তাহলে দাদা-দিদিরা তর্করত্ন পাড়ায় চলুন।'

—'সে কোথায়?'

—'আরও মাইল তিন চার ভেতর দিকে।' বসন্ত তর্করত্ন পাড়ার পুজোর বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগল প্যাডেল মারতে মারতে।

তর্করত্ন পাড়ার সার্বজনীন মহাপুজার এবার সুবর্ণজয়ন্তী। পুজো প্রবর্তন করেন যাঁর নামে এই পাড়া, সেই গজানন তর্করত্ন মশাই স্বয়ং। জ্ঞানমার্গ আর ভক্তিমার্গ দুটোতেই রত্ন এবং বিশারদ পণ্ডিতমশাই। কিন্তু প্রথম যৌবনে পাওয়া ওই তর্করত্ন উপাধিটাই কেমন করে যেন তাঁর নামের সঙ্গে বরাবরের মত জুটে গেছে। যেবার পদ্মশ্রী পেলেন সে আজ বছর কুড়ি আগেকার কথা, তখন থেকে জায়গাটা তর্করত্ন পাড়া নামে আখ্যাত হয়ে আসছে।

অশীতিপর বৃদ্ধ। শুয়ে বসেই থাকেন। দেখাশোনা করে জটাই বুড়ি যে আসলে জটাইয়ের মা। জটাই যেহেতু ক্ষ্যাপা, এক জায়গায় তাকে ধরে রাখা খুব শক্ত সেহেতু জটাইয়ের মাকে পণ্ডিতমশাই আশ্রয় দিয়েছিলেন একদা একসময়ে। কেমন করে তার আখ্যা জটাইবুড়ি হয়ে গেল সে ও এক গণমানসের খামখেয়ালের ব্যাপার। বোধনটি প্রত্যেকবার পণ্ডিতমশাইকে দিয়েই করানো হয়। এবার বললেন —পারবেন না। ক্ষীণ হাতটি তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন —'নির্বিঘ্নেই সব হয়ে যাবে, চিন্তা নাই।'

পূজা কমিটির নতুন সেক্রেটারি সত্যশরণ বলল —'প্রতিমা কেমন হল দেখবেন না পণ্ডিতমশাই, এবার একটু অন্যরকম হয়েছে যে।' —'আ...র প্রতিমা বাবা, চিত্তের মধ্যে তো তাঁকে বসিয়ে রেখেছি সেই কবে থেকেই। এখনও তো তিনি দেখা দিলেন না, অথচ পঞ্চাশটা বছর পূর্ণ হল গিয়ে।' পণ্ডিতমশাই ধুতির খুঁটে চোখ মুছলেন। প্রেসিডেন্ট জীবনবাবুর সঙ্গে সত্য চোখাচোখি করল।

পণ্ডিতমশাই এতো র‍্যাশনাল মানুষ, তর্করত্ন বলে কথা, কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে যখন পুজাটি আরম্ভ করেছিলেন, তখন করেন এই আশা করে যে তাঁরও চোখে মাতৃদর্শন হবে, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মত।

কলকাতা থেকে রিপোর্টার এসেছে শুনে সত্যশরণ যখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল তখন ক্যামেরাম্যান লম্বুর তিন চারটে কোণ থেকে ফোটো নেওয়া হয়ে গেছে। সে আবারও ক্যামেরা তাক করছে। এবার পুজোর আয়োজনের ওপর। পুরুতমশাই পোজ দিয়ে বসে আছেন। পাড়াশুদ্ধু লোক হাতে পুষ্পাঞ্জলির ফুল নিয়ে ক্যামেরার রেঞ্জের ভেতরে আসবার জন্যে হুড়োহুড়ি করছে। সত্যশরণ কাছাকোঁচা সামলাতে সামলাতে বলল —'আপনারা নাকি আমাদের নিয়ে গল্প লিখবেন!' সত্যশরণের হাতদুটো কচলাতেই যা বাকি! শিবানী মেয়েটি রহস্যময় হেসে বলল —'ভাবছি!'

জীবনবাবু এগিয়ে এসে বললেন —'তা যদি বল মা, গপ্পো লেখবার মতই! তবে একটা দিনে আর তর্করত্ন পাড়ার পুজোর কীই বা জানবে! কতটুকুই বা জানবে!'

—'তা বেশ তো,' পেছন থেকে স্টোনওয়াশ জীনস পরা ব্যায়ামবীর ছেলেটি এগিয়ে এল, কাঁধ নাচিয়ে বলল —'কদিন থাকলে স্টোরিটা পাব বলে মনে হয়?'

—'পুজোর কটা দিন অন্তত থাকো, দেখো, শোনো', ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন জীবনবাবু, 'তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না যেন, তোমার বয়সী ছেলে আছে আমার।'

ক্যামেরা গুটিয়ে মোটা ছেলেটি বলল —'বেশ বললেন তো মেসোমশাই! থাকো, দেখো, শোনো, কই খাও, দাও, শোও তো বললেন না।'

—'বলাটা বাহুল্য বলেই বলেন নি'—সত্যশরণ এগিয়ে এসেছে আবার —'ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কোনও অসুবিধে হবে না, পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি অঢেল জায়গা আর খাওয়া তো পুজোর ভোগই আছে।'

বোঝাই যাচ্ছে শিবানীই দলনেত্রী। বলল —'কি রে শ্রীলা, শুক্লা, রাজি?'

ব্যায়ামবীর বলল —'হ্যাঁ ওই দুই পিটপিটেকে রাজি করাও, আমি আর লম্বু তো তোফা থাকব।'

পণ্ডিতমশাইয়ের ব্রাহ্মণী মারা গেছেন বছর দশেক হল। ছেলে নেই। দুই মেয়ের দূর দেশে বিয়ে হয়েছে, একটি বোধহয় সাগরপার। আর একটি মারাও গেছে। নাতি নাতনিরা লায়েক হবার পর চোখে দেখেন নি পণ্ডিতমশাই। তিনখানা

খাটপালঙ্ক বোঝাই বড় বড় ঘর পড়েই আছে। ঝাড়তে ঝুড়তে পাড়ার মেয়েরাও এসে জটাইবুড়ির সঙ্গে এসে হাত লাগাল। ওদের দেখাশোনার জন্যে আলাদা কোন ব্যবস্থাই করতে হল না। আজকালের ছেলেমেয়ে সব, ভীষণ সাবলম্বী। নিজেরাই চা বানায়, নিজেরাই লন্ঠন পরিষ্কার করে তেল ভরে, চান-টান করে কাপড় মেলে দেয় উঠানের রোদ্দুরে। বলতে কি পণ্ডিতমশাই আর জটাইবুড়ির দেখভালটাও কদিন ওদের হাতেই চলে যায়।

এদের মধ্যে শিবানী একটু লেখা-জোকা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাকিরা তথ্যের খোঁজে কেউ পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে, কেউ সত্যশরণের, কেউ জীবনবাবুর, কেউ বা গাঁয়ের গিন্নিবান্নিদের কাছে ফিট হয়ে আছে। বছর দশ বারো আগেও পণ্ডিতমশাই নিজেই করতেন পুজোটা। বোধন, অধিবাস, ঘটস্থাপন, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন, কুষ্মাণ্ডবলি, কতসব খুঁটিনাটি! নতুন পুরুত অত জানেনও না, পারেনও না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তর্করত্নও অনেক নরম হয়ে এসেছেন, বলেন,—' তা চায়ের সঙ্গে একটি দুটি দিশি বিস্কুট খেয়ো, মন্ত্রগুলির সংক্ষিপ্তকরণে দোষ নাই। খালি মানসপূজাটি মন দিয়ে করবে।'

লম্বু জটাইবুড়ির ভাষায় ঘুরছে ফিরছে ফটক নিচ্ছে। গ্রামের ফটক, চণ্ডীমণ্ডপের ফটক, তর্করত্ন পণ্ডিতের ফটক, জটাইবুড়ির ফটক। একে অজ গ্রামের পুজো। উপরন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের শুচিবাই। যদি বা লাউডস্পীকার চলে তো 'যা দেবী সর্বভূতেষু' আর ভক্তিগীতি। অল্প বয়সীরা এবার বলতে শুরু করেছে 'তেমন জমছে না সত্যদা, জমজমাট কিছু লাগান এবার!' সত্যশরণ খেঁকিয়ে ওঠে —'অন্য পুজোয় চারদিন ধরে এমন ভোগ পাবি?' সত্যিই, সবার পুজো। সবাই সাধ্যমত চাঁদা দেয়। কিন্তু চারটে দিন প্রায় কারুর বাড়িই হাঁড়ি চড়ে না। সপ্তমীর দিন খিচুড়ি, অষ্টমীতে লুচি, নবমীতে পোলাও, আর দশমীর দিন সাদা ভাত। ভোগ রান্না হয় পণ্ডিতবাড়ি। পাড়ার বাছাবাছা মেয়েরা গিন্নিরা রাঁধেন। দুপুর বারোটা একটা থেকেই দীয়তাং ভুজ্যতাম্। লম্বু এইসব প্রসাদগ্রহণেরও ছবি তোলে পটাপট।

শিবানী বলল — 'ওদের জমজমাটের সাধটাই বা অপূর্ণ থাকে কেন? এই শ্রীলা, শুক্লা লাগা জলসা।'

সুতরাং অষ্টমী-নবমী দুদিন সন্ধ্যাতেই দারুণ জলসা হল। বড় কাঠের পাটাতনে হুড়হুড় করে আলপনা দিয়ে ফেলল শ্রীলা আর শুক্লা, হাত লাগাল পাড়ার ছোট মেয়েরা। স্টেজ সাজিয়ে ফেলল কুমারের সঙ্গে পাড়ার ছোট ছেলেরা, বড় ছেলেরা। যে যা জানে শোনাল। গান, আবৃত্তি, কমিক, নাটক। কিন্তু মাতিয়ে দিল

শুক্লা একাই। হেন গান নেই সে জানে না, যে যা ফরমাস করছে অবলীলায় গেয়ে যাচ্ছে। অন্যরাও যে দোয়ারকি দিচ্ছেনা তা নয়। কিন্তু সে একাই একশ। সে গান শুনে মাঝরাতে তর্করত্ন বিছানায় উঠে বসলেন —'কে গায়? আহা, নবমীতেই এমন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছুটিয়ে দিলে কে গো?'

দশমীর দিন সকালে সব্বাইকার মন খারাপ করে দিয়ে ওরা চলে গেল। বক্স ক্যামেরায় তোলা একখানা ছবি ওরা পণ্ডিতমশায়ের হাতে দিয়ে বলল —'চলি তবে, কটা দিন বড় ভালো কাটল।'

চলে গেল ওরা। একটা রিকশায় লম্বু আর কুমার। গালের ভাঁজে ভাঁজে হাসি। আর একটায় তিন মেয়ে। জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেন পণ্ডিতমশাই। বড় ভালো লেগেছে ছেলেমেয়েগুলোকে। একটাই দোষ। প্রণাম করে না।

প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছে। তর্করত্ন বহুকষ্টে সদরে এসে দাঁড়িয়েছেন। সামনে দিয়েই ওরা ঠাকুর নিয়ে যাবে। দর্শন হোক। কাঠের তলায় তলায় চাকা লাগিয়ে বিসর্জনের গাড়ি তৈরী হয়েছে। একটাতে ধরে না তাই দুটো। একটাতে দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী, আর একটাতে কার্ত্তিক-গণেশ। দেখতে দেখতে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠলেন তর্করত্ন পণ্ডিত। বিসর্জন শেষ করে যখন সবাই ফিরে এলো তখনও তিনি অশ্রুমোচন করে চলেছেন। একেবারে বিহ্বল।

মাতব্বররা সব্বাই আগে বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছেন পণ্ডিতমশাইকে। এখানেই মায়ের শতনাম লেখা, এখানেই সিদ্ধির শরবতপান। —'কাঁদছেন কেন পণ্ডিতমশাই? আসছে বছর আবার হবে!'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে পণ্ডিত বললেন —'কাঁদছি কি আর শোকে রে ভাই! কাঁদছি আনন্দে। তাঁকে চিনতে পারি নি। কিন্তু তিনি যে এসেছিলেন।'
—'কে এসেছিলেন?'

কাঁপা কাঁপা হাতে একটা রঙিন ছবি এগিয়ে দিয়ে পণ্ডিত চোখ মুছতে মুছতে বললেন —'দশ হাতে সেবা করে গেল অথচ প্রণাম করল না তাতে বুঝিনি, অলৌকিক গান শুনিয়ে গেল তাতেও বুঝিনি রে, তোদের প্রতিমার মতো ভাগে-ভাগে চলে গেল মা, কই তখনও তো........' পণ্ডিত আবার চোখ মুছলেন।

সবাই দেখল —একটা আবছা আবছা রঙিন ছবি। শিবানী দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে দুপাশে শ্রীলা আর শুক্লাকে নিয়ে। সামনে হাঁটু মুড়ে বসে লম্বু আর কুমার। মাঝখানে শিবানীর কোলের কাছে চেয়ারে বসে পণ্ডিতমশাই।

হেসে-কেঁদে পণ্ডিত বললেন —'নাম শুনেও বুঝলে না জীবন? শিবানী-শ্রীলা-শুক্লা—মা জগজ্জননী লক্ষ্মী সরস্বতী। লম্বু হল গিয়ে লম্বোদর আর কুমার

হল কুমারসম্ভবের কার্তিকেয়। ছদ্মবেশে এসে পুজো নিয়ে গেলেন মা, চিনতে পারিনি।'

কিছুকাল পরে কলকাতার এক মাঝারি বাংলা কাগজে 'তর্করত্নপাড়ার পুজো' নামে একটি ফীচার বেরল, বেশ কিছু রঙিন ছবি সমেত। লেখকের নাম পঞ্চরত্ন ঠাকুর। কাগজটা এসেছে পোস্টে সেক্রেটারী সত্যশরণের নামে। সবাই মিলে ঠিক হল সেটা পণ্ডিতমশাইকে দেখানো হবে। তাঁর অদ্ভুত ভুলটা ভাঙানো দরকার।

সকালের রোদ ফটফট করছে। শীতের মৃদু হাওয়া। জানলা দিয়ে পণ্ডিতমশাইকে দেখা যাচ্ছে খাটো ধুতি পরে তেল মাখছেন। মুখে শিশুর হাসি। পঁচাশিতে পৌঁছে তর্করত্ন পণ্ডিত যেন হঠাৎ বড় রূপবান হয়ে উঠেছেন।

হঠাৎ সত্যশরণ কাগজখানা জীবনবাবুর হাত থেকে টেনে নিল, বলল —'থাক না জীবনকাকা, থাক।'

জীবনবাবু পণ্ডিতমশাইকে দেখছিলেন। সত্যর দিকে চাইলেন, বললেন —'ঠিক সত্য, ঠিক। যার যেমন পুণ্য সে তেমনই বুঝুক।'

অবস্থান

ওয়াজিদ? ওয়াজিদ আলি শা? খিদিরপুরে থাকেন বললেন না? —কেমন উৎসাহিত উত্তেজিত গলায় বলল খুকিটি। ছুট্টে গিয়ে আজকালের সব টেপ-টাপ হয়েছে, সেই একখান চালিয়ে দিল—বাবুল মেরা নৈহার ছুট হি জায়—ঘুরে ঘুরে মিহিন সানাইয়ের সুরে বাজতে লাগল টেপটা।

—ভাল লাগছে? আপনার ভাল লাগছে এই গান? জ্বলজ্বলে চোখে খুকি বলে।

কী করবে? মাথাটা তালে তালে নেড়ে দেয় সে। ভাল আসলে লাগছে না ততটা। কিন্তুক অত উৎসাহের আগুনে ফুস করে জল ঢালা যায় কি?

খুকি অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে।

—আপনার পূর্বপুরুষের লেখা গান। জানেন তো? নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি শা। ঠিক আপনার নাম। এক্কেবারে হুবহু।

এত উৎসাহ, উত্তেজনা, গান-ফানের কিছুই বোঝে না সে।

—ওয়াজিদ নয় খুকি, আমার নাম ওয়াজির, ওয়াজির... । আলি নয়, শা নয়, মোল্লা—থেমে থেমে বলে সে। গলার আওয়াজটা বড়ে গোলামের মতো না হলেও বেশ জোয়ারিদার।

—মোল্লা? ওরে বাবা— খুকি যেন চমকে ওঠে।

—কেন? 'ওরে বাবা' কেন?

—সে আমি বলছি না— জেদি ঘাড় দোলায় খুকি।

—আমি বুজতে পেরেছি —ওয়াজির মোল্লা দাড়ির ফাঁকে হাসে।

—বুঝতে পেরেছেন তো? —খুকির গলায় সোয়াস্তি। বস্তুত দু'জনেই হাসে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ষড়যন্ত্রীর হাসি।

—কিন্তু আপনাকে ওয়াজিদ আলি শা সাহেব বলেই ডাকব। কেমন?

—এটা কিন্তুক বুজলুম না খুকিসাহেব। ওয়াজির মোল্লা মন দিয়ে পাকা পুডিং, রজন জ্বাল দেয়। নুটি ঠিক করে মার্কিনের টুকরোর মধ্যে ঝুরো তুলো ভরে।

—খুকিসাহেব? —খুকিটি ভীষণ হাসি হাসতে থাকে। লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে একেবারে।

এত হাসি! ওয়াজির মোল্লা তার পালিশের নুটি নিয়ে অপ্রস্তুত। এত কিছু মজাদারি আছে নাকি কথাটায়; নাকি সিরেফ জওয়ানি। যৌবনই এমন বাঁধভাঙা হাসি হাসায়!

খুকির বাবা একটুকুন আগে অফিস চলে গেছেন। এবার মা যাচ্ছেন। নাম্বা নাম্বা ইস্ট্র্যাপের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে খুটখুট করে ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো, না না ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া হতে যাবেন কেন? কত বড়মানুষ; এতগুলিন সামানে ল্যাকর পালিশ দিবেন। বাপ্‌রে! সেন্টের গন্ধে ভেসে যাচ্ছে চান্দিক। চকচক কচ্ছে চামড়া। কত ল্যাকর কত জলুসের জান! ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া কেন হতে যান! ইনি হলেন গিয়ে ভাল জাতের রেসের ঘুড়ি। যেমনটি কুইনের পার্কের পাশে ঘোড়দৌড়ের বাজির মাঠে দেখা যায়। অতটা নাম্বাই-চওড়াই নেই। তা না-ই থাকল।

উনি বললেন— অত কী বকবক করছিস খুকি! কাজটা হবে কখন?

—আমার হাত কামাই নেই দিদিসাহেব। নুটি চালাতে চালাতে মোল্লা বলে।

—তা হোক, খুকি, বড্ড বিরক্ত করছ!

—না মা। ইনি একজন বিশেষ মানুষ। হিস্ট্রির লোক। এঁর নাম জানো? ওয়াজিদ, ওয়াজিদ আলি শাহ্। খিদিরপুরে থাকেন।

—তা-ই-ই! ভীষণ অবাক আবিষ্কারের দৃষ্টিতে কর্ত্রী তাকালেন। —চেহারাটাও দেখেছিস!

খুকি আবার হাসতে থাকে! —তুমি তো আমজাদের চেহারার কথা ভেবে বলছ। আসল মানুষটা তো নয়! তোমার যা হিস্ট্রির সেন্‌স!

—আহা, আমরা লেম্যান তো ওইভাবেই জেনেছি! এ মিলটাও কি কম আশ্চর্যের!

ওয়াজির মোল্লা জানে না, কেন এই আশ্চর্য, কেনই বা আবিষ্কার। কিসের মিল। কেন মিল। ভুল নাম নিয়ে কেনই বা এত কচলাকচলি! তবে সে আর

শুধরে দেয় না। কী দরকার! রুজি যাদের কাছে, একটা-আধটু ভুলভাল বলে তারা যদি খুশি থাকে, থাক।

—আমার মাকে দিদিসাহেব ডাকলেন কেন?

কর্ত্রী চলে যেতে খুকিটি আবার জিজ্ঞেস করে। প্রশ্নের তার শেষ নেই।

—কেন? ভুল হয়েছে কিছু?

—না, ভুল নয়। সবাই তো মা, বউদি এ সব বলে। ও, আপনাদের 'বউদি' নেই, না?

ওয়াজির মোল্লা কাঁধের কিনার দিয়ে চিবুক চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে থাকে। —তাই তো? দিদিসাহেব কেন? এই ডাকগুলান মুখ দিয়ে আপ্‌সে বেরিয়ে যায়। এখন তার কার্যকারণ বাতলাও এই কৌতূহলী বালিকার কাছে।

মাথায় সিন্দুর নাই। ঘোমটা নাই। খাটো চুল গুছি গুছি পিঠ ঝেঁপে আছে। ঝুলঝুলে দুল। গলায় ঝুটো পাথরের দেখনাই হার। হাতেই বা কী? একটা হাতঘড়ি। একটা কাঠ না কিসের বালা। এমন ধারা শো হলে মা ডাকটা ঠিক হয় না। দিদিই ঠিক। কিন্তু এসব কথা খুকিকে বলা যাচ্ছে না। সে খানিকটা প্রশ্নের উত্তর বেমালুম উড়িয়ে-এড়িয়ে বলে— সাহেব মানে একটা মান, একটা সন্‌ভ্রম, সন্‌ভ্রম, বোঝেন তো?

খুকি আবারও প্রচুর হাসে। সন্‌ভ্রম? কী বললেন? সন্‌ভ্রম?

খুকি বলতে ঠিক যতটা বাচ্চা হওয়া দরকার, এই খুকি কি ততটা? উলিথুলি চুল। চক্ষু দুটি ডাগর। তাতে ভাসে কৌতুক, কুতুহল, কোশ্চেন, ছোট্টখাট্ট, সবই ঠিক। কিন্তু খুকি খুকি শো থাকলেও এঁর সোমত্থ বয়স হয়েছে। ঢলঢলে কামিজ তবু বোঝা যায়। তা ছাড়াও, চলন-বলন ছোটন-দাঁড়ান, কাজ-কম্মের একটা গোছ ধরন সবই ওই কথাই বলে।

—তুমি ইস্কুলে যাবে না?

—আমি কলেজে পড়ি, সেকেন্ড ইয়ার।

—ওরে বাবা! সেকেন কেলাস একেবারে? তবে তো খুব ভুল হয়ে গ্যাছে খুকিসাহেব? তা আপনি কলেজে যাবেন না!

—টেস্ট হয়ে গেছে, এখন আর যেতে হয় না।

বা বা— বাহবাটা কেন দিল মোল্লা তা জানে না।

শীতের বাতাসে বেশ আঁচ লেগেছে। শুখুটে শুখুটে দিনগুলো। পুরনো সামান সব ঘষেমেজে, বাটালি দিয়ে চেঁছে ফেলে, নতুনের সঙ্গে তাকে মানিয়ে-শুনিয়ে কাজ। দরজার এড়ো, ক্যাবিনেটের পাওট্‌ সব নতুন করে বাদাম কাঠ মাপসই

করে করা। এখন আর সব মিস্তিরি জব্বর, গোপাল, মুন্না—সব কটিকে বিদেয় করে দিয়েছে। একটু একটু করে সাজিয়ে তুলতে হবে এখন সব। একা একা। অভিনিবেশ চাই তো না কী? শীতের শুখো থাকতে থাকতে সারতে হবে।

যবে থেকে একলা কাজ করছে আপন মনে, খুকিটি সেই ইস্তক সেঁটে আছে। অবিশ্যি সেঁটে বলতে ঠিক সেঁটে নেই। মাঝে মাঝে একেবারে অদর্শন হয়ে যায়। তারপর ঘুরছে ফিরছে, কাছে এসে বসছে, এটা ওটা নাড়ছে চাড়ছে। আর ফুলঝুরির মতো কোশ্চেন।

—আরে সব্বনাশ, ও ঢাকা খুলেন না, খুলেন না।

—কেন?

—ইস্প্রিট সব ভোঁ হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে পানি । জল।

—জল? স্পিরিটে জল?

—একটু আধটু ভেজালি এই লাইনে সবাই দিচ্ছে খুকি, কাকে ফেলে কাকে ধরবেন?

—কী করে বুঝলেন জল আছে?

—এই দ্যাখেন, —নিজের মোটা মোটা খসখসে আঙুলগুলি মেলে ধরে ওয়াজির।

—চামড়া কেমন কুঁকড়ে উঠেছে দেখেছেন? এই হল গিয়ে পানির নিশানি। মনোযোগ দিয়ে দেখে খুকি।

—স্পিরিট শুদ্ধ থাকলে কী হত?

—পেলেন থাকত চামড়া— স্পিরিটের মধ্যে গালা ঢালে ওয়াজির।

—কী দিলেন ওগুলো?

—গালা, কুসমি গালা, খুকিসাহেব।

—কুসমি? কুসমি কেন?

—ডিমের কুসুম দেখেন তো? তলতলে কাঁচা-সোনা কাঁচা-সোনা বর্ণ? সেইমতো হল গিয়ে বাজারের সেরা গালা! ফার্নিচারে মারলে কাঠের ওরিজন্যাল রঙটিই ধরবে। এমন ঝিলিকদার হবে যে, এদিক থেকে লাইট মারলে ওদিকে পিছলে পড়বে।

—তা অ্যাত্তো সব হাঁড়ি-কুঁড়ি বাটি-ঘটি নিয়ে কী করছেন?

—খেলা করছি। রান্নাবাড়ি— ছোট ছেলেরা খেলে না?

—খেলাই তো!

—খেলা, কিন্তুক কেমন জানেন? পরাণপণের খেলা।

—কেন এর মধ্যে আবার প্রাণপণের কী হল?

—ও আপনি বুঝবেন না খুকিসাহেব। এ হল গিয়ে রং ফেরাবার খেলা। একেকটি খোরায় জ্ঞানের একেকটি ধরে রাখছি।

—দেখি দেখি কেমন আপনার জ্ঞানের রং!

—তো দ্যাকেন, এই রং মেহগনি, ডার্ক ব্রাউনের সঙ্গে ভুষো কালি, একটু এই অ্যাতোটুকু সিন্দুর....

—সিঁদুর?

—বাঃ, আপনারা সাজেন আর আপনাদের ফার্নিচার সাজবেন না। সিন্দুরে, আলতায়, কাজলে, সুর্মায় সাজবেন বই কী। তারপর কাপড় পড়বেন ঝা চকচক।

—কী কাপড়? সিনথেটিক তো? নাইলন! এতক্ষণে খুকি খেলাটা ধরতে পেরেছে।

—না খুকিসাহেব, ওরে কি কাপড় কয়? পরবে বেনারসি, তসর, মুগা, বিষ্ণুপুরের বালুচরি।

—ওরে বাবা! কই বেনারসি, তসর এসব কই?

—বানাচ্ছি। খাপি মিহিন খোল। এমন গ্লেজ দেবে যে সিল্কের সঙ্গে তফাত করতে পারবেন না। চোখে ঝিলিক মারবে।

—সবই তো দেখছি একরকম!

—আরে সাহেব, সবই একরকম হলে কি আর এত ছাবাছোবার দরকার হত? এই দ্যাখেন এরে কচ্ছে ওয়ালনাট। বড় বড় হৌসে এই রং লাগায়। আই সি আই, আই টি সি, টাটা স্টিল...। ওয়ালনাটেরই কি আর একরকম? তিন-চার রকম আছে খুকি। আপনারা হয়তো দেখে কইবেন মেহগনি। যে জন জানে সে জন বুঝবে।

খুকি একটা কাঠের টুকরো তুলে নিল, বলল—বাঃ, খুব সুন্দর তো ধরিয়েছেন রঙটা।

—ধরাব না? আপনার মা-বাবা এসে স্যাংশন দিবেন তবে না? কাঠের পিসে সবরকমের ধরতাই দিয়ে রাখছি।

—এতে কী দিয়েছেন?

—কিচ্ছু না, কুসমি গালার রসের সঙ্গে এই অ্যাট্টুকুনি বেগনি রং।

—তাতেই এই টিন্টটা এসে গেল?

—তাতেই। তারপর আছে ঘষামাজা। আপনারা মাথা ঘষেন না? একবার দুবার। তারপর মুখে কিরিম দাও, মোছো, আবার মাখো, আবার মোছো.... এই

সুন্দরীদেরও তেমনি। মাখবেন, তুলবেন, মাখবেন, তুলবেন। তবে না গ্লেজ আসবে। মুণ্ডু ঘুরবে দেখনদারের। এই তো সাইডটায় হাত দিয়ে দ্যাখেন।

—সত্যি তো! কী স্মুথ করে ফেলেছেন।

—আরও করব খুকিসাহেব। তারপর ফেরেঞ্চ চক মাখাব। পাউডার মাখবেন সোহাগি আমার।

তেমন তেমন লাগসই উপমাগুলো ওয়াজির মোল্লা খুকির সামনে বলা উচিত মনে করে না। —যত্ত চিকনচাকন হবে দেহখানি বিবির পালিশ তো তত্ত খুলবে! না কী?

তা এইটুকু শুনেই খুকির মুখ সামান্য লাল হয়। সে বলে ওঠে —দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনার চা-টা হল কি না দেখে আসি।

বড় গেলাসের চায়ে পাঁউরুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে তৃপ্তি করে খায় ওয়াজির মোল্লা।

—এ মা, বর্ডারগুলোতে কালো দিলেন কেন?

—উঁ হুঁ হুঁ। কালো নয়। কালো বলেন না। ও হল ডার্ক মেহগনি। যত শুকোবে তত খোলতাই হবে। হাসতে থাকবে। এই যে ভেতরে? সব ওয়ালনাট ফিনিশ দিইছি। দেখে ন্যান, ধারে ধারে একটু অন্যতম রং চাই, বুজলেন? অন্যতম কিছু। আবার ধরেন আপনাদের শয়নের ঘরে একরকম, তো বসার ঘরে বিকল্প চাই। সবখানেই ওয়ালনাট মেহগনি হলে হবে না। রোজউড দেব ক্যাবিনেটটাতে, দেখবেন চোখ যেন স্তম্ভিত হয়ে থাকতে চাইবে। একেবারে বিকল্প।

খুকি অনেকক্ষণ ধরেই হাসছিল, বলল— আপনি লেখাপড়া জানেন, না?

—কই আর জানলুম খুকি!

খুকির বাবা এসে ডাকেন— মিস্ত্রি।

—জি!

—নতুন রং করা চেয়ারে বসলাম, গ্লেজ তো উঠে গেল।

—তা তো যাবেই সাহেব।

—সে কী! তাহলে এত কষ্ট করে খরচা করে পালিশ করার মানে কী!

—আহা এখনও তো ফিনিশ হয়নি! শেষ অন্তে ল্যাকার পালিশ চড়াব। চক্ষে ধাঁধা লেগে যাবে।

—গ্লেজ?

—উঠবে না সাহেব। দশটি বচ্ছর চোখ বুজে থাকতে পারবেন।

—পারলেই ভাল—সাহেব গটমট করে চলে যান।

—হ্যাঁ কী যেন বলছিলেন! খুকি সুযোগ পেয়ে কাছিয়ে আসে।

ফাগুন চোতে আকাশ যেন রক্ত-পলাশ! কাছে ভিতে জঙ্গল, বাগান, চরের মাটি, নদীর পাড়, এমন কি মেঠো হেটো রাস্তার দু'ধার অবধি সবুজে সবুজ! ন্যাড়া গাছের ডালে ডালে দ্যাখ-না-দ্যাখ কচি পাতা তিড়িং বিড়িং নেচে নেচে বার হয়ে যাচ্ছে। দুই বোনের এক লগ্নে বিয়ে দিয়ে সারল পঞ্চানন। বলল —'বাবা, তোমার একটুকখানি খালি খালি লাগবে। তোমার বউমার তো শতেক কাজ! তার মাঝে তোমার নাতিনদের মতো হাতে-হাতে মুখে মুখে তো বেচারি পারবে না! একটু বুঝো!'

যার বলবার কথা সে বলল। এখন যার শোনবার কথা সে তো শোনেওনি। এমন দিনে রানি-বিমলা দুই বোন ঠাকুর্দাদার দুইপাশ থেকে পাকা চুল তোলবার ভান করত 'ও মা, মা, ঠাকুর্দা, কোথায় যাব গো! তোমার যে কাঁচা কালো চুল উঠছে গো,' খুশি হয়ে উঠত কুঞ্জ, অবাক নয় কোনমতেই। এটাই যেন স্বাভাবিক।

—'কটা? কটা? গুনে দেখ তো দিদি!'

—'একটা ছিঁড়ে তোমায় দেখাব?'

—'উঁ হুঁ হুঁ — প্রবল প্রতিবাদ তুলত কুঞ্জ, 'পাঁচ কুড়ি পুন্ন হলে নতুন পাতার মতো নতুন চুলও গজায় রে, শরীল নতুন হয়ে ওঠে। দেখছিস না গাছপালায় সব পাতাপুতি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে!'

—'তুমি দেখতে পাচ্ছ?'

—'তা এক রকম পাচ্চি বইকি! বলরামচুড়োয় কেমন কালচে সবুজ পাতার টুপি এসেছে। মানুষেরও অমনি হয়!'

হাসি চেপে রানি বলত —'তাহলে ঠাকুর্দা তোমার চোখ-কানও আবার হবে?'

—'হবেই তো' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় কুঞ্জর, 'আবার কোমর সোজা করে দাঁইড়ে লাঙল ধরবুনি? ছেঁয়াটা তো সদরে দোকান দিচ্ছে, না পয়সা জলে দিচ্ছে। পঞ্চার পাশে কে দাঁড়ায় দিদি! পঞ্চাটা আমার খেটে খেটে হেলে গেল।'

হেলে কিন্তু পঞ্চানন যায়নি। চোত মাসের সকাল ন'টা থেকেই কাঠ ফাটে। ভাঁটরোর গ্রামাঞ্চলটুকু সবুজে সবুজ, তবু একটুখানি ছায়া ছায়া। কিন্তু ভ্যানগাড়ি নিয়ে বাজার হাটে বেসাতি করতে গেলে নৌকোয় নদী পেরিয়ে আগে পড়বে মাঠ। তাতে আদিগন্ত কোথাও জিরেন নেই, বাস রাস্তায় একবার ঠেলে উঠতে পারলে ভ্যানগাড়ি শনশনাশন চলবে, তখন কোনও বড়সড় গাছের ছায়ায় দুদণ্ড গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেয়ে নেওয়াও যেতে পারে। পঞ্চার গাড়িতে কাঁচকলার কাঁদি, কাঁটালি কলা, এঁচোড়, থোড়, পাকা পেঁপে, কাঁচা পেঁপে, সজনে ডাঁটা, বেগুন, লঙ্কা, নেবু! সব কুঞ্জর বাগানের।

সন্ধ্যে ঘুরে গেল। তুলসীতলার পিদিমটি নিবু-নিবু। অন্ধকার ঘোর হচ্ছে। আনাচে কানাচে ঝিঁঝির প্রবল প্রতিপত্তিতে ঝিনিঝিনি খত্তাল বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। কুঞ্জ বলল—'পঞ্চা যে এখনও এল না বউমা!' ছেলে বাড়ি না থাকলেই সে সন্ধ্যে থেকেই কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঘর বার করে।

বউ বললে —'বেরুতে একটু বেলা তো হল, মাংসটা কাটল, কুটল, রাঁধল, তবে না বেরুনো। গাড়ি চুড়ো করে আনাজপাতি নিয়ে গেছে বাবা। ভাঙা হাট অবধি না দেখে কি আর সে আসছে! তুমি খেয়ে নাও।'

—'খাব কী গো? ছেঁয়াটা আসুক।'

—'সে যদি আসে এখন তেতপ্পরে। চান না করে ভাতেও বসবে না। তুমি বুড়ো মানুষ। এখনই তো ঢুলছ দেখছি, ...'

—'তালে দিয়েই দাও। মাংসটা আছে তো?'

মুখ টিপে হেসে বউ বলে, —'আছে গো আছে, আর কারুর না থাক তোমার আছে। তা চোতের গরমে দু'বেলা মাংস, খাবে তো?'

—'চোতের গরম? কোথায়? সাঁঝ হতে না হতেই তোমার চোত পালিয়েছে, ফুরফুর করে গাঙের হাওয়া দিচ্ছে এমন!'

দাওয়ায় পাতা করে বুড়োকে এনে গুছিয়ে বসিয়ে দিয়ে যায় বউ। কাঁসার বড় বাটিতে মাংস। আজ অনেক দিন পর গাঁয়ে খাসি কাটা হল, পঞ্চা তার নিজের ভাগ পাতা মুড়ে নিয়ে এসে নিজেই টুকরো টুকরো করেছে, নিজেই রেঁধেছে, কষে ঝাল দিয়ে। খেতে খেতে ঝালে টকাটক আওয়াজ তোলে কুঞ্জ। চোখ দিয়ে জল পড়ে। কিন্তু সোয়াদ কী? মুখ যেন ছেড়ে গেল!

ভাত-টাত ঝোল মেখে শেষ করে সবে দাঁত বসিয়েছে একখানা হাড়ের ওপর জুত করে, বাইরে লোকজনের আওয়াজ পাওয়া গেল। লণ্ঠন তুলে বউ সদরে আলো দেখায়। চার পাঁচজন জোয়ান লোক ভ্যানগাড়ি থেকে পঞ্চাকে নামিয়ে দাওয়ায় রাখলে। মাঠের মধ্যেই নাকি ভ্যানগাড়ি থেকে উলটে পড়েছিল। হাট-ফিরতি লোক দেখতে পেয়ে তক্ষুনি আবার হাসপাতালে নিয়ে গেছে, ডাক্তার দেখে বলেছে—ইস্টেরোক। হাসপাতালে ভর্তি করার জায়গা নেই। ওষুধ পত্র দিয়ে, ছুঁচ ফুঁড়ে, যা করবার করে ছেড়ে দিয়েছে। এখন কী কী খাওয়াতে হবে না হবে গোপাল কর্মকার পঞ্চার বউকে সব বুঝিয়ে বলছে।

হাড়টা এতক্ষণে ভাল করে ভাঙতে পেরে গেছে কুঞ্জ। ভেতরের রসটুকু জিভ সরু করে চুষতে চুষতে বলছে —'পঞ্চা এলি? সঙ্গে কে র‍্যা! নিধু নাকি? শালো খচ্চর তুমি খাসির রাঙের লোভে লোভে কুঞ্জ মাঝির ঘরে রাত দুপুরে

কাঞ্চন রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে খুকি। চওড়া জাম রঙের পাড়। ভেতরে জরির সুতো, কালো সুতো চমকাচ্ছে। আর জামাতে বেশ খলখলে হাসকুটে কালো, কালো না মেহগনি, বুঝি খুকিও ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। কোনও উৎসবে যাবে বোধহয়।

—'অন্যতম' হয়েছে?

হাসি দাড়ি বেয়ে টাপুর টুপুর ঝরে।

—হয়েছে, হয়েছে।

—আর 'বিকল্প'?

চতুর্দিকে হাতড়ান মোল্লাসাহেব। 'বিকল্প'টি কি ঠিক হল? 'বিকল্প' বলে কি তিনি সবসময় এক কথাই বোঝাতে চান? 'বিকল্প' মানে এখন, এখানে 'অবিকল্প'। সেরকমটি? হয়েছে কি?

খুকি রিনরিন করে হাসে। বোঝার চোখে তাকায়।

—বিকল্পটা ঠিক হল না, না শা সাহেব?

—হল না কি? —হাঁ হাঁ করে ওঠেন ওয়াজির মোল্লা— এখন একেবারে বেগমসাহেবা। হানড্রেড পার্সেন। দু'জনেই ষড়যন্ত্রীর মতো হাসতে থাকেন। একটা যে রঙ্গ হয়ে গেল সেটা উভয়েই বুঝেছে। শিল্পীর চোখে বিকল্প অর্থাৎ অবিকল্প? তাও কি সম্ভব?

—আচ্ছা চলি বেগমসাহেবা....

—আবার আসবেন ওয়াজিদ আলি শা সাহেব....

ওয়াজির মোল্লা কিছু দূর চলে গিয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়ান।

—ওয়াজিদ নয় কিন্তুক। ওয়াজির.... ওয়াজির মোল্লা। খিদিরপুরে বাস নয়, কাজ-কাম করি ওখানে, নাহারবাবুদের ফ্যাকটরিতে। সাকিন ন'পাড়া বাগনান, সাউথ ইস্টার্ন রেলোয়ে।

নিজস্ব শিল্পভাবনার অবিকল্প নিশানখানা কাঁধের ওপর প্রশান্ত গর্বে তুলে ধরে নতুন পাড়ার দিকে রওয়ানা দ্যান ওয়াজির মোল্লা। কোনও ইতিহাস, পুরাণ, কিংবদন্তীর সঙ্গে অন্বিত হতে চান না। কিছুতেই।

বারান্দা

আলমারির গা-আয়নায় চুল আঁচড়ানো এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। জলের ছিটে লাগবেই লাগবে। ঘোলাটে জলের ছিটে। পার্থর চুল খুব ঘন, একটু লম্বা। জলসুদ্ধ না আঁচড়ালে বসতে চায় না। এদিকে মায়ের কড়া হুকুম আছে, জলের ফোঁটা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মুছে দিতে হবে। মা বলে, বসন্তের গুটির মতো দেখায়। আয়না জিনিসটা পরিষ্কার করে মোছা কিন্তু কঠিন কাজ। এদিকটা ঠিক হল তো ওদিক দিয়ে ল্যাজ বেরলো। বাথরুমে একটা ছোটখাটো বেসিন আর আয়নার ব্যবস্থা যে কেন করা গেল না পার্থর মাথায় ঢোকে না। বললেই, মা বলবে —তুই করবি। এটা এমন কি একটা মহামারী ব্যাপার যে পার্থর জন্য অপেক্ষা করতে হবে! মা যেন বলতে চায়—তোর বাবা তোদের সবই করে দিয়েছে। ওই বেসিন আর আয়নাটুকুই যা বাকি। ওইটুকুই করে দেখা!

ধ্যাত্তেরি! যত শিগগির সম্ভব রাধুদার দোকানে একটা চোদ্দ ইঞ্চির বেসিন আর একটা আয়না-অলা ছোট ক্যাবিনেট দর করতে হবে। ওরাই মিস্ত্রি দিয়ে বসিয়ে দেবে। ট্যুইশনির রোজগার পার্থর নেহাত মন্দ নয়। তার জামাকাপড়, রাহা-খরচ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, সিনেমা-থিয়েটার, ক্যাসেট-ট্যাসেট, এমন কি ছোটখাটো বেড়ানো পর্যন্ত সবই তাতে হয়ে যায়। উপরন্তু সে সব সময়েই কিছু না কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা করে যাচ্ছে। মায়ের হাতে মাঝে মাঝে কিছু দেয়ও। একটা বেকার ছেলের কাছ থেকে বাবা-মা আর কী আশা করতে পারে!

বাবা ঘরে ঢুকে বলল—তোর মাকে দেখেছিস? বাবার হাতে এক তাড়া খবরের কাগজ।

—এইটুকু তো কৌটোর মতো একটা জায়গা। যাবে আর কোথায়?

তর্করত্নপাড়ার পুজো

মহাসপ্তমীর দিন ন'টা একুশের লোকালে কয়েকটি ছেলেমেয়ের একটি দল একটা অখ্যাত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে নামল। একখানা বেঞ্চি কোনমতে খাড়া আছে, ফেরিওলার হাঁক মিয়োনো, স্টেশন চত্বরে কোন ভিড় নেই এই পুজোর বাজারেও। দলের মধ্যে একটি ছেলে যেমন লম্বা তেমন মোটা। অপরজন বেশ ব্যায়ামবীর-ব্যায়ামবীর। ব্যায়ামবীর মোটার দিকে তাকিয়ে বলল —'চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখ ঠিক জায়গাতেই নেমেছি মনে হচ্ছে রে লম্বু, কী বল শিবানীদি?' এরা শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণী। এদের ফটোগ্রাফি, গৃহসজ্জা, ফ্যাশন, ছবি-আঁকা, গান-বাজনা ইত্যাদি সব বিষয়েই অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে, পড়াশোনার ডিগ্রি ছাড়াও। কিন্তু তিনবছর চেষ্টা করেও কেউ একটা মনোমত চাকরি জোগাড় করতে পারে নি। তাই ওরা জোট বেঁধেছে। নিজেদের অন্ন নিজেরাই জুটিয়ে নেবে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা-চওড়া মেয়েটি টিকেট-কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করল —'আচ্ছা, এখানে পুজো হচ্ছে কোথায় বলতে পারেন?'

—'পুজো?' বুকিং ক্লার্ক মশাই চশমার ওপর দিয়ে চেয়ে বললেন —'কোথায়? না কোথায় কোথায়? হিসেব দেওয়ার সাধ্যি আমার নেই মা।'

পেছন থেকে একটি রিকশাঅলা হেঁকে বলল —'আসুন না দাদা-দিদিরা, আমি সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। দুটো রিকশয় তিরিশটা টাকা লাগবে কিন্তু।'

মেয়েটি বাকি সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল —'চল, সেটাই ভাল।'

অবিলম্বে দুটো রিকশা এসে গেল। একটাতে বসেছে তিনটি মেয়ে। বড়সড়টি মাঝখানে। অন্যদুটি ছোটখাটো। তারা দু'পাশে। হুড নামানো সীটের দু'ধারে।

ছেলেদুটি আরেকটি রিকশয়। নোদলগোদল লম্বু রিকশার তিনভাগ জুড়ে একাই। বাকি জায়গাটাতে কোনমতে বসে ব্যায়ামবীর বলল —'বাপ্‌স রে, বসা তো হল কোনমতে। এখন এই খোঁদল থেকে নামতে পারলে হয়। লম্বু তুই ডায়েট কর।'

লম্বু বলল —'জীবনের চার্মটাই যে তাহলে চলে যাবে রে!'

দু'চারটি ঠাকুর দেখতে দেখতেই কিন্তু ওরা সব্বাই হই হই করে উঠল। —'আরে এতো আখচার দেখছি! এর মধ্যে নতুনত্ব কই? সেই কয়েকটা পুতুল বসানো আছে। মাথার ওপরে কাপড়ের চিত্তির-বিচিত্তির, লাউড-স্পীকারে লেটেস্ট ফিলমি গান। 'ধুর, আমরা পিওর গ্রামের পুজো দেখতে চাই ভাই। ও রিকশাওয়ালা!'

রিকশাওয়ালা বসন্ত বলল —'তাহলে দাদা-দিদিরা তর্করত্ন পাড়ায় চলুন।'

—'সে কোথায়?'

—'আরও মাইল তিন চার ভেতর দিকে।' বসন্ত তর্করত্ন পাড়ার পুজোর বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগল প্যাডেল মারতে মারতে।

তর্করত্ন পাড়ার সার্বজনীন মহাপুজার এবার সুবর্ণজয়ন্তী। পুজো প্রবর্তন করেন যাঁর নামে এই পাড়া, সেই গজানন তর্করত্ন মশাই স্বয়ং। জ্ঞানমার্গ আর ভক্তিমার্গ দুটোতেই রত্ন এবং বিশারদ পণ্ডিতমশাই। কিন্তু প্রথম যৌবনে পাওয়া ওই তর্করত্ন উপাধিটাই কেমন করে যেন তাঁর নামের সঙ্গে বরাবরের মত জুটে গেছে। যেবার পদ্মশ্রী পেলেন সে আজ বছর কুড়ি আগেকার কথা, তখন থেকে জায়গাটা তর্করত্ন পাড়া নামে আখ্যাত হয়ে আসছে।

অশীতিপর বৃদ্ধ। শুয়ে বসেই থাকেন। দেখাশোনা করে জটাই বুড়ি যে আসলে জটাইয়ের মা। জটাই যেহেতু ক্ষ্যাপা, এক জায়গায় তাকে ধরে রাখা খুব শক্ত সেহেতু জটাইয়ের মাকে পণ্ডিতমশাই আশ্রয় দিয়েছিলেন একদা একসময়ে। কেমন করে তার আখ্যা জটাইবুড়ি হয়ে গেল সে ও এক গণমানসের খামখেয়ালের ব্যাপার। বোধনটি প্রত্যেকবার পণ্ডিতমশাইকে দিয়েই করানো হয়। এবার বললেন —পারবেন না। ক্ষীণ হাতটি তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন —'নির্বিঘ্নেই সব হয়ে যাবে, চিন্তা নাই।'

পুজা কমিটির নতুন সেক্রেটারি সত্যশরণ বলল —'প্রতিমা কেমন হল দেখবেন না পণ্ডিতমশাই, এবার একটু অন্যরকম হয়েছে যে।' —'আ...র প্রতিমা বাবা, চিত্তের মধ্যে তো তাঁকে বসিয়ে রেখেছি সেই কবে থেকেই। এখনও তো তিনি দেখা দিলেন না, অথচ পঞ্চাশটা বছর পূর্ণ হল গিয়ে।' পণ্ডিতমশাই ধুতির খুঁটে চোখ মুছলেন। প্রেসিডেন্ট জীবনবাবুর সঙ্গে সত্য চোখাচোখি করল।

মার চোখে তিরস্কার। বাবা বলল —দেখো তো! কেউ বলেনি, অথচ এক তাড়া কাগজ গুঁজে দিয়ে গেছে কোল্যাপসিবলের খাঁজে। দেখাচ্ছি মজা! এবার দাম দেব না এসব কাগজের।

এক চুমুকে দুধটা শেষ করে দরজার দিকে পা বাড়াল পার্থ, বলল —দ্যাখো, হয়ত দাদাদের অর্ডার ছিল, ওখানে দিতে গিয়ে এখানে দিয়েছে!

সিঁড়ি ভাঙতে লাগল সে। চারতলায় ফ্ল্যাট তাদের। তার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু বাবার হার্টের গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। অ্যানজাইনার ব্যথা হয়। বাবার পক্ষে এই চারতলার সিঁড়ি রোজ রোজ ভাঙা মোটেই ঠিক নয়। মায়ের হাঁটুর ব্যথা। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মহিলার এই আর্থারাইটিস জাতীয় কিছু একটা হবেই। তবুও চূড়ান্ত অদূরদর্শীর মতো বাবা এই ফ্ল্যাটটা কিনল। বাড়িটা তাদের পুরনো হয়ে গিয়েছিল, আপাদমস্তক সারানো মানে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার ধাক্কা, সেটা বাবার পক্ষে বার করা মুশকিল ছিল। সবই ঠিক। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, বাড়িটা তো বাবা সে জন্যে বিক্রি করেনি! করেছে দাদার ম্যানেজমেন্ট পড়বার টাকা যোগাড় করতে। এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটা কিনে দাদার পড়ার খরচটাও হয়ে যাবে বলে বাবা ঝট করে বাড়িটা ঝেড়ে দিল। দাদা এঞ্জিনিয়ারিং শেষ করতে না করতেই ভাল চাকরি পাচ্ছিল। তারাই কোনও সময়ে ওকে ম্যানেজমেন্টের কোর্স করিয়ে নিত, কিন্তু দাদার তর সইল না। সবচেয়ে দামি কোর্স করার জন্যে পরীক্ষা দিয়ে, ইন্টারভিউ দিয়ে একেবারে গেট সেট গো। দাদা চাকরি করলে যে সুরাহাটা হত সেটা তো হলই না, উপরন্তু অতিরিক্ত টাকার ধাক্কা। ঠিক কত টাকা, বাবা-মা তাকে বলেনি কখনও। কিন্তু লাখের যথেষ্ট ওপরে হবেই এ বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই। তাদের মতো পরিবারের ছেলের এই ধরনের গা-জোয়ারি উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনও যুক্তি আছে!

বাবার যুক্তি ছিল—তীর্থ ওখান থেকে পাশ করেই বিশাল একটা মাইনের চাকরি পাবে। পার্থর বলার ইচ্ছে হয়েছিল—চাকরিটা তীর্থ পাবে বাবা, তুমি তো কিছুতেই পাচ্ছ না!

ইচ্ছে হলেও সব কথা বলা যায় না। পাঁচ বছর আগেকার কথা তার ওপর। বয়সটাও তো পাঁচ বছর কম ছিল! তবু কিছু কিছু বলতে সে ছাড়েনি। দাদাকেই বলেছিল—তোর একটা অ্যামবিশন পূর্ণ করবার জন্যে বাবাকে তার পিতৃপুরুষের বাড়ি বিক্রি করতে হচ্ছে, এটা তুই কেমন করে হতে দিচ্ছিস আমি জানি না দাদা।

দাদা অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল, একেবারেই সেটা আশা করেনি কেউ, পার্থ না, বাবা না, মা তো না-ই।

দাদা বলেছিল—পিতৃপুরুষ তো আমারও, বাড়িটায় আমারও তো অংশ আছে।

বলে ফেলে খুব অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল দাদা—আমি প্রতিটি পাই পয়সা শোধ করে দেব বাবা, দেখো!

তা অবশ্য দিতে চেয়েও ছিল দাদা, বাবা এত বোকা, এত সেন্টিমেন্টাল যে নিল না। বোধহয় পিতৃপুরুষের বাড়িতে বড় ছেলের অংশ থাকার কথাটা বিঁধেছিল বুকে। হয়ত ভেবেছিল টাকাটা যদি ঋণও হয়, সে ঋণ শোধ না হলে ছেলের সঙ্গে সম্পর্কটা পোক্ত থাকবে। টাকাও হারালো, ছেলেও বাবা-মার থাকল না। টাকাটা থাকলে পার্থর ফটো-কপি মেশিন ও আনুষঙ্গিকের একটা সুরাহা হত। কিংবা কে জানে, বাবা হয়ত এক ছেলেকে দিয়ে ঠকেছে বলে আর এক ছেলেকে আর দিতই না।

নিজেকে এক সময়ে খুব নিচ মনে হল পার্থর। বাবা এই সেদিনও খেদ করছিল, পুরনো বাড়িটা থাকলে তার একতলার রাস্তার দিকের ঘরটায় পার্থর ফটো-কপি-মেশিন, ক্রমে ক্রমে অ্যামোনিয়া প্রিন্টিং মেশিন এ-সব বসতে পারত।

বাবা আঁসলে একেবারেই প্র্যাক্টিক্যাল নয়। বাড়িটা যতই পুরনো হোক, ছোট হোক, একটা গোটা বাড়ি। ছিলও কর্নার প্লটে। লোকেশনের একটা আলাদা মূল্য আছে। ফট করে যা পেল নিয়ে বেচে দিল। এই ফ্ল্যাটটা সাতশো স্কোয়ার ফুটের। দুটো ছোট ছোট শোয়ার ঘর। বসার ঘর ছাড়া এক চিলতে খাবার জায়গা আর দক্ষিণে এতটুকু একটা বারান্দা। বিয়ে করে দাদার সুবিধেই হল আলাদা থাকবার। একই তলায় উল্টোদিকের ফ্ল্যাটটা খালি ছিল। সেটাই ভাড়া নিয়ে আছে। তবে শিগগিরিই দিল্লি কি বোম্বাইয়ে পোস্টিং পেয়ে যাবে। তারপর আর এই আবাসনে দাদা ফিরছে না। একথা বাবা-মা যদি না-ও জানে, পার্থ অভ্রান্তভাবে জানে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে একটা বিশ্রী ঠোক্কর খেল পার্থ। কয়েকটা থান ইট সারি বেঁধে রাখা। ছিটকে পড়ছিল পার্থ। খুব সামলে নিয়েছে। তিনটি বালক ঢুকছিল গেট দিয়ে। শাঁ-শাঁ করে ছুটে এল।

—চোট লাগল? পার্থদা? পচা বলল।

—কে রেখেছে এখানে থান ইটগুলো?

—আমরা—অপরাধী গলায় বলল ওরা, ছাদ থেকে নামিয়ে আনছিলুম... উইকেট হবে...

—চমৎকার! তা আমাকেই তো আউট করে দিচ্ছিলি। সঙ্গে সঙ্গে এগুলো সরাতে কী হয়েছিল?

—দ্যাখো না, দ্যাখো না, তিনজনে কলবল করে ওঠে—হাওয়াই চপ্পল দিয়ে

শুক্লা একাই। হেন গান নেই সে জানে না, যে যা ফরমাস করছে অবলীলায় গেয়ে যাচ্ছে। অন্যরাও যে দোয়ারকি দিচ্ছেনা তা নয়। কিন্তু সে একাই একশ। সে গান শুনে মাঝরাতে তর্করত্ন বিছানায় উঠে বসলেন —'কে গায়? আহা, নবমীতেই এমন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছুটিয়ে দিলে কে গো?'

দশমীর দিন সকালে সব্বাইকার মন খারাপ করে দিয়ে ওরা চলে গেল। বক্স ক্যামেরায় তোলা একখানা ছবি ওরা পণ্ডিতমশায়ের হাতে দিয়ে বলল —'চলি তবে, কটা দিন বড় ভালো কাটল!'

চলে গেল ওরা। একটা রিকশায় লম্বু আর কুমার। গালের ভাঁজে ভাঁজে হাসি। আর একটায় তিন মেয়ে। জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেন পণ্ডিতমশাই। বড় ভালো লেগেছে ছেলেমেয়েগুলোকে। একটাই দোষ। প্রণাম করে না।

প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছে। তর্করত্ন বহুকষ্টে সদরে এসে দাঁড়িয়েছেন। সামনে দিয়েই ওরা ঠাকুর নিয়ে যাবে। দর্শন হোক। কাঠের তলায় তলায় চাকা লাগিয়ে বিসর্জনের গাড়ি তৈরী হয়েছে। একটাতে ধরে না তাই দুটো। একটাতে দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী, আর একটাতে কার্ত্তিক-গণেশ। দেখতে দেখতে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠলেন তর্করত্ন পণ্ডিত। বিসর্জন শেষ করে যখন সবাই ফিরে এলো তখনও তিনি অশ্রুমোচন করে চলেছেন। একেবারে বিহ্বল।

মাতব্বররা সব্বাই আগে বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছেন পণ্ডিতমশাইকে। এখানেই মায়ের শতনাম লেখা, এখানেই সিদ্ধির শরবতপান। —'কাঁদছেন কেন পণ্ডিতমশাই? আসছে বছর আবার হবে!'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে পণ্ডিত বললেন —'কাঁদছি কি আর শোকে রে ভাই! কাঁদছি আনন্দে। তাঁকে চিনতে পারি নি। কিন্তু তিনি যে এসেছিলেন।'
—'কে এসেছিলেন?'

কাঁপা কাঁপা হাতে একটা রঙিন ছবি এগিয়ে দিয়ে পণ্ডিত চোখ মুছতে মুছতে বললেন —'দশ হাতে সেবা করে গেল অথচ প্রণাম করল না তাতে বুঝিনি, অলৌকিক গান শুনিয়ে গেল তাতেও বুঝিনি রে, তোদের প্রতিমার মতো ভাগে-ভাগে চলে গেল মা, কই তখনও তো........' পণ্ডিত আবার চোখ মুছলেন।

সবাই দেখল —একটা আবছা আবছা রঙিন ছবি। শিবানী দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে দুপাশে শ্রীলা আর শুক্লাকে নিয়ে। সামনে হাঁটু মুড়ে বসে লম্বু আর কুমার। মাঝখানে শিবানীর কোলের কাছে চেয়ারে বসে পণ্ডিতমশাই।

হেসে-কেঁদে পণ্ডিত বললেন —'নাম শুনেও বুঝলে না জীবন? শিবানী-শ্রীলা-শুক্লা—মা জগজ্জননী লক্ষ্মী সরস্বতী। লম্বু হল গিয়ে লম্বোদর আর কুমার

হল কুমারসম্ভবের কার্তিকেয়। ছদ্মবেশে এসে পুজো নিয়ে গেলেন মা, চিনতে পারিনি।'

কিছুকাল পরে কলকাতার এক মাঝারি বাংলা কাগজে 'তর্করত্নপাড়ার পুজো' নামে একটি ফীচার বেরুল, বেশ কিছু রঙিন ছবি সমেত। লেখকের নাম পঞ্চরত্ন ঠাকুর। কাগজটা এসেছে পোস্টে সেক্রেটারী সত্যশরণের নামে। সবাই মিলে ঠিক হল সেটা পণ্ডিতমশাইকে দেখানো হবে। তাঁর অদ্ভুত ভুলটা ভাঙানো দরকার।

সকালের রোদ ফটফট করছে। শীতের মৃদু হাওয়া। জানলা দিয়ে পণ্ডিতমশাইকে দেখা যাচ্ছে খাটো ধুতি পরে তেল মাখছেন। মুখে শিশুর হাসি। পঁচাশিতে পৌঁছে তর্করত্ন পণ্ডিত যেন হঠাৎ বড় রূপবান হয়ে উঠেছেন।

হঠাৎ সত্যশরণ কাগজখানা জীবনবাবুর হাত থেকে টেনে নিল, বলল —'থাক না জীবনকাকা, থাক।'

জীবনবাবু পণ্ডিতমশাইকে দেখছিলেন। সত্যর দিকে চাইলেন, বললেন —'ঠিক সত্য, ঠিক। যার যেমন পুণ্য সে তেমনই বুঝুক।'

অন্দরমহলের মাঝ মধ্যিখানে একখানা ঘরে সে পড়াত আগে। তখন অন্দরমহলের যাবতীয় শব্দ, যাবতীয় কার্য-কলাপ তার কর্ণগোচর হত। একদিন বাড়ির কোনও বউ, মধুমিতার মা-কাকিদের কেউ নিজ শাশুড়ি ও তাঁর খাস দাসীর মুণ্ডপাত করছিলেন, মধুমিতা খুব লজ্জা পেয়েছিল। তারপর থেকে তিনতলার একটা একটেরে ঘরে পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

এখন সিঁড়ি টপকে টপকে সেই তিনতলার টুঙ্গি ঘরেই গিয়ে উপস্থিত হল সে। মেঝে চকচকে লাল। চকচকে কালো বর্ডার ডেওয়া। মোজেইক, মার্বেল সব কিছুকেই হার মানায় এদের এই চকচকে লাল মেঝে। লম্বা লম্বা গরাদ দেওয়া দরজার মতো জানলা সব। পুরোটা খুলে দিলে মনে হয় আকাশে বসে আছি। চারপাশের সব কিছুই দেখা যায়। সব কিছু অবশ্য খুব সুবিধের নয়। চাপ চাপ বাড়ি। সোজা এক লাইনে চলে গেছে। মাঝখানে বেশিরভাগই এতটুকু ফাঁক নেই। কোথাও বা খোলা নর্দমা চিকচিক করছে। অদূরে বাজার এবং তজ্জনিত ভিড়, বেসুরো হইচই।

টেবিলের ওপর বইপত্র সব গুছোনো। বিষয় ভাগ করা। মধুমিতা খুব গুছোনো মেয়ে, এটুকু বলতেই হবে। ওর দিদি দেবমিতা পড়াশোনায় খুবই ভাল ছিল, মধুমিতা তার ধার দিয়েও যায় না। কিন্তু খুব পরিপাটি। হাতের লেখাও চমৎকার, গোটা গোটা, ভুল গুলো নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই উকিল-তনয়াকে মাধ্যমিকের সময় থেকেই টেনে তুলছে পার্থ। সে সময়টায় বাড়ি বিক্রি আর ফ্ল্যাট তৈরির ফাঁকে তারা হাওড়ার সন্ধ্যা বাজারে বাস করছিল। হাতের কাছে এই টুইশনিটা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল সে, দুই বোনেই পড়ত তখন। বড়টি তখন ফাইন্যাল ইয়ার, পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স। নিজেও পড়ুয়া মেয়ে ছিল, পার্থকেও প্রচুর খাটিয়ে নিত। দেবমিতার বিয়ে হয়ে গেলে এখন শুধু মধুমিতা। এখনও খাটুনি আছে তবে তার ধরন অন্যরকম। মধুমিতাকে এক জিনিস অন্তত তিনবার লেখাতে হয়। অথচ মধুমিতার বাবা তাকে ছাড়তে চান না। ছাত্রী সম্পর্কে তারও যে একটা দায়িত্ববোধ জন্মে যায়নি একথাও বলা যায় না। একটা রোখ। গ্র্যাজুয়েশনের গণ্ডিটা পার করিয়েই ছাড়বে।

কিছু টাস্ক দেওয়া ছিল। কিন্তু টেবিলের ওপরটা পরিষ্কার। সামনে কোনও খাতা দেখতে পেল না পার্থ। কিছুক্ষণ বসে বসে বিরক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। লিখতে দিলেই মধুমিতা এই কীর্তি করবে। লিখতে নারাজ। করবে তো এ বই সে বই থেকে সংকলন। যাকে বলে পাইল দেওয়া। এই কাজটাই দেবমিতা করত চমৎকার। মধুমিতাকে সে প্রাণপণে শেখাচ্ছে, পারছে না। বোধহয় পারবার

ইচ্ছেটাই নেই। বাপের পয়সা-কড়ি আছে। আদুরে তার ওপর। এদের কোনও তাগিদ থাকে না পড়াশোনার। বইয়ের পাঁজায় একটা ময়ূরের পালক গোঁজা একটা খাতা এবার চোখে পড়ল পার্থর। টেনে বার করল খাতাটা। ঠিক। এটাই। ময়ূরের পালক, বট-পাকুড়ের পাতা, চাঁপা ফুল এই সব দিয়ে বই-খাতার মার্কা করা মধুমিতার রীতিই বটে। খাতাটা সামনে রাখতে কী হয়েছিল? উল্টে-পাল্টে দেখল পার্থ। নাঃ লিখেছে। তবে এডিটিং-এর কাজ আজও ভাল হয়নি। মাঝে মাঝে স্টার মার্ক দিয়ে লিখে দিতে হবে তাকে।

উত্তরটার শেষ পাতায় এসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পার্থ। ঘটা করে লেখা —সমাপ্তি। কিন্তু তারপর কোলন ড্যাশ দিয়ে যা লেখা তা কোনওমতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তরের সমাপ্তি নয়।

পার্থদা, আপনি বোকা, না অন্ধ জানি না। যদি আমায় কোনওদিনই বুঝবেন না তবে আমার জীবনে এলেন কেন? আমার কিছুই ভাল লাগে না। সবাই কত সুখী। আমার একারই খালি মন-খারাপ করে। নীরস বইগুলো শুধু আপনি পড়ান বলেই পড়ি। আপনার তেতো বকুনিগুলোও একই কারণে দিনের পর দিন হজম করি। এ পাড়ার সুজনদা (চাটার্ড), আমার বন্ধুর দাদা সিদ্ধার্থ (ওষুধের বিজনেস) আমার জন্যে পাগল। কিন্তু আমার কাউকেই ভাল লাগে না। আপনাকে ছাড়া কাউকেই ভাবতে পারি না। জানি, আপনি বলবেন—আপনার চাকরি নেই। কিন্তু এম.এ. বি.এল' পাশ করেছেন। ইনকাম-ট্যাক্স প্র্যাকটিস করুন না। বাবাকে একটু ধরলেই হেলপ করবে (দয়া করে বকা দেবেন না)।

চোখ না তুলেও পার্থ বুঝল মধুমিতা এসে দাঁড়িয়েছে। কোনও লাল ড্রেস পরেছে বোধহয়, রোদ আড়াল করে লাল ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। আড়চোখে দেখে খাতার মধ্যে মুখ ডোবাল পার্থ। টকটকে ফর্সা মধুমিতা। একেবারে লাল হয়ে গেছে। চশমার আড়ালে চোখ দুটো স্তিমিত।

—আমি কি আসব? ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করল।

পার্থ জবাব দিল না।

—আসব?—গলা কাঁপছে ওর।

—তোমার ঘরে তুমি আসবে না তো কি ইউ.এস.এ-র ফার্স্ট লেডি আসবেন?

লম্বা বিনুনির প্রান্তের চুলগুলো আঙুলে পাকাচ্ছে মধুমিতা।

—খাতায় এটা কী করেছো?

মধুমিতা কেঁদে ফেলল।

—কী? বলো? নরমতর গলায় প্রশ্ন করল পার্থ।

শুধরে দেয় না। কী দরকার! রুজি যাদের কাছে, একটা-আধটু ভুলভাল বলে তারা যদি খুশি থাকে, থাক।

—আমার মাকে দিদিসাহেব ডাকলেন কেন?

কর্ত্রী চলে যেতে খুকিটি আবার জিজ্ঞেস করে। প্রশ্নের তার শেষ নেই।

—কেন? ভুল হয়েছে কিছু?

—না, ভুল নয়। সবাই তো মা, বউদি এ সব বলে। ও, আপনাদের 'বউদি' নেই, না?

ওয়াজির মোল্লা কাঁধের কিনার দিয়ে চিবুক চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে থাকে। —তাই তো? দিদিসাহেব কেন? এই ডাকগুলান মুখ দিয়ে আপ্‌সে বেরিয়ে যায়। এখন তার কার্যকারণ বাতলাও এই কৌতূহলী বালিকার কাছে।

মাথায় সিন্দুর নাই। ঘোমটা নাই। খাটো চুল গুছি গুছি পিঠ ঝেঁপে আছে। ঝুলঝুলে দুল। গলায় ঝুটো পাথরের দেখনাই হার। হাতেই বা কী? একটা হাতঘড়ি। একটা কাঠ না কিসের বালা। এমন ধারা শো হলে মা ডাকটা ঠিক হয় না। দিদিই ঠিক। কিন্তু এসব কথা খুকিকে বলা যাচ্ছে না। সে খানিকটা প্রশ্নের উত্তর বেমালুম উড়িয়ে-এড়িয়ে বলে— সাহেব মানে একটা মান, একটা সন্‌ভ্রম, সন্‌ভ্রম, বোঝেন তো?

খুকি আবারও প্রচুর হাসে। সন্‌ভ্রম? কী বললেন? সন্‌ভ্রম?

খুকি বলতে ঠিক যতটা বাচ্চা হওয়া দরকার, এই খুকি কি ততটা? উলিথুলি চুল। চক্ষু দুটি ডাগর। তাতে ভাসে কৌতুক, কুতুহল, কোশ্চেন, ছোট্টখাট্ট, সবই ঠিক। কিন্তু খুকি খুকি শো থাকলেও এঁর সোমত্থ বয়স হয়েছে। ঢলঢলে কামিজ তবু বোঝা যায়। তা ছাড়াও, চলন-বলন ছোটন-দাঁড়ান, কাজ-কম্মের একটা গোছ ধরন সবই ওই কথাই বলে।

—তুমি ইস্কুলে যাবে না?

—আমি কলেজে পড়ি, সেকেন্ড ইয়ার।

—ওরে বাবা! সেকেন কেলাস একেবারে? তবে তো খুব ভুল হয়ে গ্যাছে খুকিসাহেব? তা আপনি কলেজে যাবেন না!

—টেস্ট হয়ে গেছে, এখন্ আর যেতে হয় না।

বা বা— বাহ্‌বাটা কেন দিল মোল্লা তা জানে না।

শীতের বাতাসে বেশ আঁচ লেগেছে। শুখুটে শুখুটে দিনগুলো। পুরনো সামান সব ঘষেমেজে, বাটালি দিয়ে চেঁছে ফেলে, নতুনের সঙ্গে তাকে মানিয়ে-গুনিয়ে কাজ। দরজার এড়ো, ক্যাবিনেটের পাওট্ সব নতুন করে বাদাম কাঠ মাপসই

করে করা। এখন আর সব মিস্তিরি জব্বর, গোপাল, মুন্না—সব কটিকে বিদেয় করে দিয়েছে। একটু একটু করে সাজিয়ে তুলতে হবে এখন সব। একা একা। অভিনিবেশ চাই তো না কী? শীতের শুখো থাকতে থাকতে সারতে হবে।

যবে থেকে একলা কাজ করছে আপন মনে, খুকিটি সেই ইস্তক সেঁটে আছে। অবিশ্যি সেঁটে বলতে ঠিক সেঁটে নেই। মাঝে মাঝে একেবারে অদর্শন হয়ে যায়। তারপর ঘুরছে ফিরছে, কাছে এসে বসছে, এটা ওটা নাড়ছে চাড়ছে। আর ফুলঝুরির মতো কোশ্চেন।

—আরে সব্বনাশ, ও ঢাকা খুলেন না, খুলেন না।

—কেন?

—ইস্প্রিট সব ভোঁ হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে পানি । জল।

—জল? স্পিরিটে জল?

—একটু আধটু ভেজালি এই লাইনে সবাই দিচ্ছে খুকি, কাকে ফেলে কাকে ধরবেন?

—কী করে বুঝলেন জল আছে?

—এই দ্যাখেন, —নিজের মোটা মোটা খসখসে আঙুলগুলি মেলে ধরে ওয়াজির।

—চামড়া কেমন কুঁকড়ে উঠেছে দেখেছেন? এই হল গিয়ে পানির নিশানি। মনোযোগ দিয়ে দেখে খুকি।

—স্পিরিট শুদ্ধ থাকলে কী হত?

—পেলেন থাকত চামড়া— স্পিরিটের মধ্যে গালা ঢালে ওয়াজির।

—কী দিলেন ওগুলো?

—গালা, কুসমি গালা, খুকিসাহেব।

—কুসমি? কুসমি কেন?

—ডিমের কুসুম দেখেন তো? তলতলে কাঁচা-সোনা কাঁচা-সোনা বর্ণ? সেইমতো হল গিয়ে বাজারের সেরা গালা। ফার্নিচারে মারলে কাঠের ওরিজ্ন্যাল রঙটিই ধরবে। এমন ঝিলিকদার হবে যে, এদিক থেকে লাইট মারলে ওদিকে পিছলে পড়বে।

—তা অ্যাত্তো সব হাঁড়ি-কুঁড়ি বাটি-ঘটি নিয়ে কী করছেন?

—খেলা করছি। রান্নাবাড়ি— ছোট ছেলেরা খেলে না?

—খেলাই তো!

—খেলা, কিন্তুক কেমন জানেন? পরাণপণের খেলা।

নধরকান্তি, বেশ জামাই-জামাই। হঠাৎ দেখলে যদি দুধ-ঘি খাওয়া ক্যাবলাকান্ত মনে হয়, সে মনে হওয়া ভুল। এম-এস ডাক্তার। শিগগিরই বিদেশ যাবে। তার পাশে পার্থ বিশ্বাস? একটা এম-এ ডিগ্রি, একটা এল.এল.বি। কোনওটাই ভালো নয়। হাইট পাঁচ আট। রঙ মাঝারি। স্বাস্থ্য মোটামুটি। দাড়ি-গোঁফ দুই-ই থাকায় একটা বোহেমিয়ান বোহেমিয়ান চেহারা। বাবা-মার একটা সাতশ স্কোয়্যার ফুটের ফ্ল্যাট আছে উত্তর কলকাতায়। উদ্বৃত্ত পয়সা-কড়ি কিস্যু নেই।

হঠাৎ গোঁত্তা খেল পার্থ। আচ্ছা, মধুমিতা তার এই দাড়ি-গোঁফের প্রেমে পড়েনি তো? সে শুনেছে দাড়ি-গোঁফে তাকে খুব আঁতেল-আঁতেল, ভাবুক-ভাবুক দেখায়। অনির্বাণ তার বন্ধু বলে —হেভি অ্যাপিল তোর পার্থ।

ঘড়ি দেখল পার্থ। সাড়ে এগারোটাও বাজেনি। আজকের সকালটা দেওয়া ছিল মধুমিতাদের বাড়িকে। অপ্রত্যাশিত ছুটি মিলে গেল। কিন্তু এখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। অনির্বাণদের ওখানে গেলে হয় না? ব্যক্তিগত ব্যাপার কারও সঙ্গে আলোচনার করার ধাত নেই পার্থর। কিন্তু এ ব্যাপারটা এখনও খুব ব্যক্তিগত কী? একটু যেন পরামর্শর দরকার ছিল। তেমন বুঝলে চেপে যাওয়া যাবে!

বেশির ভাগ বন্ধুই তার মোটামুটি সফল। জয় তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এখানে কোথাও চান্স পেল না। বাঙ্গালোর থেকে মোটা টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে এঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোল। হায়দ্রাবাদে আছে এখন। চিরঞ্জিৎ দিল্লী চলে গেল। সে-ও একগাদা খরচ করে সেলস ম্যানেজমেন্ট পড়ল। ওখানেই পোস্টেড। বিল্টু অতি সম্প্রতি অলটারনেটিভ মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করে, আরামবাগে বসছে। করে খাচ্ছে। সে যখন পল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়তে ঢুকল, তখনই বন্ধুরা বলেছিল হেভি মুশকিলে পড়বি। তার ভরসা ছিল বেজাল্ট ভাল হবে, অন্তত এডুকেশন লাইনে যেতে অসুবিধে হবে না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার সঙ্গী ছিল অনির্বাণ। সাধারণভাবে বি.কম করে মুখ চুন করে ঘুরে বেড়াত। ওর বাবা-জ্যাঠাতে মিলে শেষে মোটা টাকা বার করে দিলেন। হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ল, এখন ডাঁটে কেটারিং-এর বিজনেস করছে। একমাত্র পার্থরই বাবার মোটা টাকা বার করবার ক্ষমতা নেই। খুব সম্ভব এবার ও বাতিলের দলে পড়ে যাবে।

ভেতরের তেতো ভাবটা এত বেড়ে গেল যে, অনির্বাণদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করল না আর। লঞ্চ ধরে বাবুঘাট গেল সে। তারপর উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে লাগল দক্ষিণের দিকে, গঙ্গার ধার ধরে ধরে।

দুপুর দুটো নাগাদ পার্থর খেয়াল হল সে বাড়ি না ফিরলে মা-ও খেতে পারবে

না। কিছু বলে আসেনি। একটা পে-বুথ থেকে সে ফোন করে দিল। ফোনটা দাদার বাড়িতে। দাদার লোক ধরেছিল। পার্থ কড়া গলায় বলেছে, এখুনি গিয়ে মাকে বলে আসতে সে আটকে গেছে। কোথাও খেয়ে নেবে।

ময়দানে বসে বসে ক্রিকেট দেখতে দেখতে সময়টা কেটে গেল। বসেই বসেই ঝালমুড়ি, ফুচকা, চটপটি খাওয়া হল কিছুক্ষণ সময় বাদ বাদ। রোদের রঙ বাসি মড়ার মতো হয়ে আসা অবধি পার্থ ময়দানেই বসে রইল। তারপর উঠে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। ক্যাথিড্রাল রোডের মোড় থেকে মানিকতলায় নিজেদের বাড়ি পর্যন্ত পুরো পথটা হাঁটতে থাকল পার্থ, যেন হেঁটে হেঁটেই নিজের ভেতরকার চিন্তা, তিক্ততাগুলোকে ক্ষইয়ে ফেলবে।

বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার গাঢ়। সেই চারতলা। কত কিলোমিটার হেঁটেছে আজ? জীবনে কখনও এতটা হেঁটেছে বলে মনে করতে পারল না পার্থ। কেন হাঁটল? গন্তব্য না থাকলে তবেই বোধহয় মানুষ এভাবে হাঁটে।

দাদার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। বৌদি দাঁড়িয়ে। —তোমার একটা ফোন এসেছে পার্থ। দুপুরেও একবার এসেছিল। এখন বারান্দা দিয়ে ভাগ্যিস দেখতে পেলুম তুমি আসছ....

ফোনটা তুলল পার্থ।

—হ্যালো...

চুপ ও দিকটা। কিছুক্ষণ পর খুব ক্ষীণ গলা ভেসে এল।

—আমি মৌ, মানে মধুমিতা বলছি।

—বলো।

—আপনি বোধহয় আমাকে খুব... মানে খুব খারাপ ভাবছেন?

পার্থ হাসল, নিজের কাছেই হাসিটা খুব নার্ভাস লাগল—ভাবার কোনও কারণ আছে কি?

—কী জানি? যেভাবে চলে গেলেন...সারাদিন বাড়ি ফেরেননি...

—আমার কাজ হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া তোমার তো কাজে মন ছিল না...

পার্থর পা অবশ লাগছে, সে চেয়ার টেনে বসল।

—শুনুন, আপনি আমাকে ভাবতে বলেছিলেন, আমি ভেবেছি। ...আপনিও একটু ভাবুন। ...একটু...। অনুনয়ের সুর গলায়।

চুপ করে রইল পার্থ।

—কী হল? শুনছেন?

—শুনছি।

—ফোন ধরেই ভাবতে শুরু করে দিলেন না কি?

—কী ভাবব তাই-ই তো জানি না।

—পার্থদা আপনার গলা শুনলে আমার ভেতরটা কেমন... মানে আমি কেমন হয়ে যাই।

—খুব ভালো। কী ভাবব, তা তো বললে না?

—এই আমাকে আপনি ভালো...মানে আপনি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন কি না। ...জানি এগুলো ভেবে-চিন্তে হয় না। হবার হলে হয়, না হলে হয় না। তাই না? কিন্তু আমি আপনাকে এতটাই...মানে...আমি রিস্‌ক নিতে রাজি আছি।

বলতে বলতে মধুমিতার গলা একেবারে ভেঙে গেল। পার্থ বুঝতে পারল ও অনেক কষ্টে কান্না সামলাচ্ছে।

সে দেখে নিল বউদি এ তল্লাটে নেই। তারপর মৃদুস্বরে বলল —ছি মউ, কেঁদো না। কেউ শুনলে?

—ভয়েই মরে যাচ্ছেন, না?

—না, ভয় না।

—তবে কী? লজ্জা? ঘেন্না?

—না। খুব জটিল ফিলিং মউ, তুমি বুঝবে না।

—চেষ্টা করলে আমিও কিছু কিছু বুঝতে পারি। শুনুন, আপনি ভেবে নিন, তারপরে আমি বাবাকে বলব।

—সর্বনাশ! কী বলবে?

—বলব। যা বলবার। আপনাকে জড়াব না। ভয় নেই।

ফোন কেটে দেবার শব্দ হল।

—বউদি, যাচ্ছি! পার্থ জানান দিল।

—ঠিক আছে, দরজাটা টেনে দিও।

বউদিদের দরজাটা টেনে দিয়ে নিজেদের দরজায় এসে পার্স থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল পার্থ। এটা সে প্রায়ই করে। বাবার পক্ষে তাড়াতাড়ি ছুটে আসা ভালো না, মা পায়ের ব্যথার জন্য তাড়া করতে পারে না। দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে তার ভালো লাগে না। তাই ডুপ্লিকেট চাবিটা সে রাখে।

দরজাটা বন্ধ করে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে উল্টো দিকে বারান্দায় চোখ পড়ল পার্থর। বসার ঘরে খুব মৃদু একটা আলো জ্বলছে। বসার ঘর আর বারান্দার মাঝখানে কাচের দরজা। ওদিকে অন্ধকার। মা বাবা দুজনে পাশাপাশি

বসে আছে। পার্থ জানে না কী ছিল এ দৃশ্যটাতে, কেনই বা সে দাঁড়িয়ে গেল। মা-বাবা তো চুপচাপ বসেই আছে। পাশাপাশি। অন্ধকারে। মনে হতে পারত একা, পরিত্যক্ত, হতাশ। কিন্তু তা মনে হল না। সারাজীবন এই হিসেব করে করে চলা, এক পা এগোনো তো তিন পা পেছনো, ছেলের জন্যে পিতৃপুরুষের ভিটে বেচা, এক সন্তান স্বার্থপর, অন্যজন অকৃতী অধম, সামান্যতম সঞ্চয়, বড় কোনও অসুখ-বিসুখ করলে তেমন চিকিৎসার আশাও নেই। তবু কিসের জোরে যে মা-বাবা ওভাবে বসে থাকে! ওই অতটুকু বারান্দায়!

মাঝখানের দরজাটা খুলে যাচ্ছে।

মা।

কী করে যে টের পায় সে ফিরেছে!

—এলি! বাবার গলা।

—এলাম, বাবা।

মউ বলছিল ভাবতে। বলছিল সে রিস্‌ক নিতে রাজি।

পার্থর ভেতরটা টনটন করছে।

সে ভাবল সে-ও রাজি। রিস্‌ক নিতে।

মুক্তি

'যা বোঝো না তা নিয়ে মাথা ঘামিও না তো।'

একটু যেন ঝাঁজ কমলেশের গলায়।

কোন পরিবারের ছেলে সৌম্যজিৎ তা জানো? আগেকার দিনের স্টিভেডর ওর ঠাকুরদাদা। চেহারাতে আভিজাত্যের ছাপ সীলমোহর করে বসানো। তাছাড়া কতটুকুই বা ছেলে! ওরা পরস্পরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করছে—আমরা মাঝে পড়ে বাধা দেব কেন? কত কমপ্লিকেশনস এর থেকে হতে পারে জানো? ছেলে মেয়ের আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কমপ্লেক্স গ্রো করতে পারে....' তাপসী বরের সমর্থন পেয়ে আহ্লাদিত হয়ে বলল —অল্পবয়সের এইসব রিপ্রেশন থেকেই তো নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কে হয়ত তোতলা হয়ে গেল, কার হাত পা কাঁপছে, কেউ প্রচণ্ড রাগী। আমাদের সাইকোলজিতে পড়তে হয়েছে মা। তা ছাড়া বড়লোকের ছেলে বলে মিড্‌লক্লাসেব সঙ্গে মিশবে না এ সব কমপ্লেক্স আজকের দিনে অচল।

মুক্তি বললেন —'বড়লোক ছোটলোক বুঝি না। ছেলেটা একদম ভাল না। ছোটনকে বিপথে নিয়ে যাবে। মেলামেশাতে সোজাসুজি বাধা দিতে কে বলেছে? একটু বুদ্ধি করেও তো করা যায়! বলিস তো আমি করতে পারি।'

—'না, না' কমলেশ জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো, 'আজকালকার বাচ্চা, ইনটারফিয়ার করলে একেবারে হাতের বাইরে চলে যাবে।'

মুক্তি হতাশ হয়ে বললেন —'তবে আর কি! আমি বারান্দায় গিয়ে বসে থাকি!'

—'তা কেন? তুমি তো ঠাকুরঘরে গিয়ে বসতে পারো!' কমলেশ বলল।

—'এই তো ঠাকুরঘরে ফুল-জল দিয়ে এলুম, আবার কী? অত ঠাকুর-ঠাকুর বাই আমার নেই খোকা। বারান্দায় বসতে না দিস তো আমি রথীনবাবুদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।'

—'তাই যান না!' তাপসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে —'আসলে কী জানেন? বারান্দায় কেউ বসে থাকলেই ছোটন ভাববে ওর জন্য কেউ দুশ্চিন্তা করছে। চটে যাবে।'

—'সে চটে যাবে বলে আমরা বারান্দায় বসবো না? এ তো আচ্ছা জুলুম?' বিরক্ত হয়ে মুক্তি পায়ে চটি গলালেন।

রাস্তার ওধারেই ডক্টর রথীন সমাদ্দারের বাড়ি। মিলিটারিতে ছিলেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে কয়েক বছর এখানে এসে বসেছেন। পশার বেশ জমেছে। এদের পারিবারিক ডাক্তারও তিনিই। বাড়িতে তিন চারটে কুকুর আর ডক্টর সমাদ্দারের পিসিমা থাকেন। পিসিমার সঙ্গে মুক্তির জমে ভাল।

কমলেশ চৌধুরীর মা মুক্তি চৌধুরী মাঝারি সাইজের একটি মহিলা। মোটা তো নয়ই"রোগাও নয়। কোঁকড়া চুলে পাক ধরেছে। সোনালি চশমার পেছনে বেশ ঝকঝকে দুটো চোখ। রঙ আধা-ফরসা। আজ পরনে কালো আঁশ পাড় টাঙ্গাইলের শাড়ি। দুহাতে সরু সরু কটা চুড়ি, সোনার চেন গলায়। গণ্ডে একটি লাল তিল। আরও তিল গজাচ্ছে। পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের বিধবা। নাতি-নাতনি আদর করে বলে মডার্ন ঠাকুমা। কেন না মুক্তি আই এস সি পাশ করেছিলেন। এখনও গলা ছেড়ে দিব্যি গান, এবং স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত চিরকাল সামলে এসেছেন।

কমলেশের বাবা মোটামুটি পসার-অলা উকিল ছিলেন। তাঁর টাকাকড়ি কোথায় কী লগ্নি হবে, আমানত হবে সে সব ঠিক করা মুক্তিরই কাজ ছিল। এমনকি সল্টলেকের এই বাড়ির সরকারি জমি কেনা, বাড়ি তৈরি—এ সব মুক্তি দাঁড়িয়ে থেকে না করালে হত কিনা সন্দেহ। কর্তা মারা গেছেন আজ পনের ষোল বছর। এখন মুক্তি ছেলে বউকে টপকে বারো বছরের নাতনি আর চোদ্দ বছরের নাতিকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যান। থিয়েটার তাঁর বড্ড প্রিয়।

এই মুক্তিকে নিয়েই তাঁর ছেলে-বউ কমলেশ-তাপসী সম্প্রতি পড়েছে মহা মুশকিলে। মুশকিলটা অবশ্য শুরু তাদের ছেলে-মেয়ে জন্মের পর থেকেই। তার আগেটায় মা বেশ বুঝদারই ছিল। কমলেশ তার ক্লাস-বান্ধবী তাপসীকে বিয়ে করতে চাইলে তো তার বাবা —'সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে আবার বিয়ে কী? পলিটিকস্ করে ওসব মেয়ে নিয়ে কি কেউ সুখী হয়?'—এই সব প্রশ্ন তুলে

বেঁকে বসেছিলেন। মুক্তিই তখন তাঁকে বোঝান বিয়ের মোটিভেশন আজকাল কতটা বদলে গেছে। পুত্রার্থে তো নয়ই, সংসারার্থেও নয়, বুদ্ধি-বৃত্তি-রুচি-আদর্শ এসবের মিলযুক্ত মানুষের সঙ্গে যতদিন সম্ভব কাটানোটাই এখন জরুরি। আর সুখ? ও হয় তো হবে, নইলে হবে না। উপরন্তু পরস্পরকে বিয়ে করতে চাইছে এরকম দুটি বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ের মাঝখানে কোন অজুহাতই খাড়া করা ঠিক নয়। এই সময়েই কমলেশ-তাপসী মুক্তির অতি-আধুনিক মনের পরিচয় পেয়েছিল। কিন্তু বয়স মানুষকে একটা না একটা সময়ে কাবু করে ফেলবেই। কিছুদূর পর্যন্ত পরের প্রজন্মের সঙ্গে কেউ কেউ হাঁটতে পারেন। তারপরে আর তাল রাখতে পারেন না। পিছিয়ে পড়েন। এটাই স্বাভাবিক। জীবনের নিয়ম। মুক্তিও পারছেন না। কিন্তু তিনি তা কিছুতেই মানতে চাইছেন না। তাঁর ভাবটা তিনি যেন ছেলে-বউ তো বটেই, নাতি-নাতনিরও সমবয়সী। কোনও জেনারেশন গ্যাপ নেই।

কিন্তু নাতি-নাতনির নামকরণেই মুক্তির রক্ষণশীলতার ব্যাপারটা প্রথম বোঝা যায়। নাতির নাম তিয়াষ, নাতনির নাম পিয়াসা। শুনে মুক্তি বললেন —'নামেতে কি আর আসে যায়। সত্যি কথা। গোলাপে যে নামে ডাকো সুগন্ধ বিতরে। কিন্তু একী কাণ্ডজ্ঞান তোদের! দুটোকেই তেষ্টায় ছাতি ফাটিয়ে মারছিস মা-বাপ হয়ে। অন্য নাম দে বাপু।'

কমলেশ বলে —'কেমন পোয়েটিক নাম বলতো?'

—'এসব আজকাল পোয়েট্রিতেও চলছে না খোকা, তা যদি বলিস।'

কমলেশ মজা করে বলল, —'পিতৃপিতামহদের নামগুলো ছিল জগদ্দল টাইপ, আমাদের গুলো হল কোনক্রমে জলচল, এবার আসছে কল্পনা, কবিতা, আমরা শোধ নিচ্ছি ধরো।'

মুক্তি বললেন, —'এর চেয়ে যে তোদের বাপ-ঠাকুর্দার পঞ্চানন, মনমোহনও ভাল ছিল রে! তিয়াষ-পিয়াসা শুনলে আশুতোষ জীবিত থাকলে ক ভল্যুম এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে তাড়া করতেন কে জানে?'

যতই আপত্তি করুন আর যুক্তি দেখান, কমলেশ-তাপসীর বড় সাধের নাম পাল্টালো না। মাঝখান থেকে মুক্তি পিছিয়ে পড়তে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নাতি-নাতনি কিন্তু তাঁকে মডার্ন বিশেষণে বিশেষিত করেছে। আসল কথা ছোটন আর পুঁটু দুই নাতি-নাতনিই সর্বভুক। বাবা-মা দুজনেই কাজে বেরিয়ে যেত। ঠাম্মার কাছেই অক্ষর পরিচয়। অক্ষর পরিচয় হতে না হতেই গড়গড় করে পড়া। যা পায় তাই পড়ে। পঞ্জিকা থেকে, খবরের ঠোঙা থেকে সব। তারপর একদিন তাদের মা দেখল পুঁটু আর ছোটন কাড়াকাড়ি করে 'চরিত্রহীন' পড়ছে।

বইটা তাপসী ছোঁ মেরে কেড়ে নেয়।

মুক্তি উল বুনছিলেন, বললেন, —'পড়ুক না তাপসী, ওদের বয়সে যতটুকু নেবার তার বেশি নিতে পারবে না। মাঝখান থেকে ভাষার শক্ত ভিত হয়ে যাবে।' ঠাম্মার প্রশ্রয়ে ছোটন-পুটু মহানন্দে শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-রবীন্দ্রনাথ গোগ্রাসে গিলছে। সেই সঙ্গে ঠাম্মাকে একেবারে নিজেদের সমমানসী ভাবছে।

কিন্তু ইদানীং ঠাম্মার এই আধুনিকতায় একটু যেন চিড় ধরেছে। ছোটনের বন্ধুদের মধ্যে আজকাল একটি নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে—সৌম্যজিৎ গাঙ্গুলি। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি স্মার্ট, উপরন্তু পকেটে সব সময়ে টাকা-পয়সা ঝমঝম করছে। এই ছেলেটিকে মুক্তি কেন কে জানে দেখতে পারেন না। প্রথম দিনেই বলেছিলেন, —'তুমি গলায় ওটা কী পরেছো সৌম্যজিৎ? সোনার হার নাকি?'

—'হ্যাঁ, ঠাকুমা। আমার ইচ্ছে হল চাইলাম, বাবা কিনে দিল।'

—'তোমার হার পরতে ইচ্ছে হয়? তার ওপরে সোনার? বলো কী? যে কোনও সময়ে চোর-ছ্যাঁচোড়ে টেনে নিতে পারে যে!'

—'হার পরা আজকাল টপ ফ্যাশন যে! জানেন না ঠাকুমা? নিলেই হল? তাছাড়া কত নেবে? নিলে আরেকটা পরবো... আরেকটা!'

ছেলেটির কথাবার্তা মুক্তির ভাল লাগে নি। তবু তিনি কিছু বলেন নি। ছেলেমানুষদের কত বন্ধু আসে, কত বন্ধু যায়, নিজেদের রুচিমতো বন্ধুর বৃত্ত ঠিক হয়ে যায় শেষে। কিন্তু সৌম্যজিৎ যেন ছোটনের সঙ্গে সঙ্গে পুটুকেও বশ করেছে। অন্য বন্ধু-বান্ধব কমে যাচ্ছে। জিতু আসে না, বিপণ আসে না। সুমিত, বজ্র, রাকা, দীপান্বিতা—ছোটন-পুটুর সঙ্গে সঙ্গে এরা মুক্তিরও বন্ধু ছিল। এখন খালি সৌম্যজিৎ। সৌম্যজিতের বাড়ি। ঠাম্মার সঙ্গে সেই সরস আড্ডাগুলো আর হয় না। হয় না মা-বাবার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক। সৌম্যজিৎ একা যেন অন্য সব সম্পর্কগুলোকে খেয়ে ফেলছে।

মুক্তি একদিন জিজ্ঞেস করলেন, —'হ্যাঁরে ছোটন, সৌম্যজিতের বাড়িতে কে কে আছেন রে?'

-'কেন?'

—'এমনি! কৌতূহল হয় না?'

—'ওদের বাড়িতে তোমার কৌতূহল মেটাবার মতো কেউ নেই ঠাম্মা। মা কোথায় থাকেন কোনদিন দেখিনি। বাবার গাড়ি মাঝে মাঝে আসে যায়, ব্যস। আমাদের বিরক্ত করবার কেউ নেই। তিন চারটে ঘর নিয়ে সৌম্য থাকে, চাকর

আছে, তারা আমরা যা চাই করে দেয়। সৌম্যদের বাড়িতে আমরা একেবারে ফ্রি।' —আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছোটন বলল।

সেই থেকে মুক্তি খুঁত খুঁত করছেন, —'তোরা কিছু কর কমলেশ, তাপসী কিছু করো।'

সৌম্যজিতদের বাড়ির টেনিস লনে খেলে খেলে ছোটন পুঁটু এদিকে রীতিমতো টেনিস প্লেয়ার হয়ে উঠছে। ওদের সুইমিং পুলও আছে। একদিন বলে ফেলেছিল পুঁটু। কিন্তু ঠাম্মার কড়া নিষেধ সৌম্যর বাড়িতে যেন পুঁটু সাঁতারে না নামে।

—'তুই তো লেকেই যাচ্ছিস সাঁতার কাটতে। আবার বন্ধুর বাড়ি সাঁতার কাটবার কী আছে? কী মনে করবে বল তো!' —ঠাম্মার উক্তি।

—'কেন? কী আবার মনে করবে? মনে করবার জন্যে কে বসে আছে ওদের বাড়ি?'

—'লোকজনও তো আছে? সৌম্য নিজেও তো আছে!'

—'সৌম্য?' বলে মুচকি হেসে পুঁটু চুপ করে যায়।

সেদিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে ঠাম্মা বলেন, —'আত্মসম্মান একটা বড় জিনিস রে পুঁটু!'

তাপসী মাঝখান থেকে শুনে বলে, —'কী বিষয়ে কথা হচ্ছে রে পিয়া? কার আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হল?'

পিঁয়া ওরফে পুঁটু সবটা বলতে তাপসী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, —'কী যে একেকটা কথা বলেন না, বারো বছরের মেয়ের আবার আত্মসম্মান। ওদের মধ্যে এতো কমপ্লেক্সও ঢোকাতে পারেন আপনি।'

মুক্তি বললেন, —'বারো বছর খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বয়স তাপসী। আত্মসম্মানবোধ আরও ছোট থেকে জাগে মানুষ বিশেষে, কিন্তু বারো বছরেও না জাগলে বিপদ! খুব বিপদ! আর কমপ্লেক্স? একেবারে কমপ্লেক্সহীন মানুষ আছে? তোমাদের সাইকলজি কী বলে? কিছু কিছু কমপ্লেক্স থাকা ভালো। আমার কথাগুলো সবই উড়িয়ে দিও না, একটু ভেবে-চিন্তে মতামত দিও। আর পুঁটু, তুই কিন্তু ওই সৌম্যদের বাড়ি খবরদার সাঁতার কাটতে যাবি না।' রায় দিয়ে মুক্তি আর দাঁড়ালেন না।

পুঁটু অবশ্য ঠাম্মার খুব আদরিণী। কথাটা শুনলো। কিন্তু স্কুল ফেরত হুটহাট সৌম্যজিতের বাড়ি যাওয়া ওদের আটকানো গেল না। চলে যায়, ফেরে ওদের গাড়ি করে। যতক্ষণ না আসে বোঝা যায় মুক্তি যেখানেই থাকুন, যে ভাবেই থাকুন, ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

মুক্তি

একদিন কমলেশ বাড়ি ফিরে দেখল মা তিনবার তার সামনে দিয়ে চলে গেল, অথচ যেন দেখতেই পেল না। তাপসীকে ইশারায় জিজ্ঞেস করতে তাপসী ফিসফিস করে বলল, —'ছোটন, পিয়া এখনও স্কুল থেকে ফেরে নি, মানে সৌম্যদের বাড়ি গেছে, তাই!'

শেষ কথাগুলো বোধহয় মুক্তি শুনতে পেলেন, হঠাৎ কমলেশের সামনে এসে চেয়ার টেনে বসে বললেন, —'তোরা কী ভেবেছিস বল তো! ওইটুকু টুকু ছেলে-মেয়ে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল বাড়ি ফিরছে না, কিছু বলবিও না, করবিও না!'

কমলেশ বলল, —'আহ্ হ্যা, ওরা সৌম্যর বাড়ি গেছে, গাড়িতে পৌঁছে দেবে....।'

—'গাড়িতে পৌঁছে দিলেই আর ভাবনার কোনও কারণ থাকে না? পড়াশোনা নেই? এইখানে পাশের গলিতে জিতুদের বাড়ি গেলে তো বকে ধমকে একসা করতিস! তবে কি ছেলে-মেয়ে গাড়ি চড়তে পাচ্ছে বলেই চুপ করে রয়েছিস?'

কমলেশ রেগে গিয়ে বলল, —'মা, তুমি এমন একেকটা কথা বলো! গাড়িটা মেনশন করছি সিকিউরিটির জন্য। আর জিতু? জিতুদের বাড়িতে অযথা সময় নষ্ট হত।'

—'সৌম্যদের বাড়িতে কীভাবে সময় লাভ হচ্ছে শুনি?'

তাপসী বলল, —'ওদের স্কুলের মিসেস ডিবেচা, মিঃ ত্রিবেদী, অরুন্তুদ মুখার্জি সব্বাই সৌম্যকে পড়ান। ছোটন আর পিয়া যদি সেখানে কিছু না হোক বসেও থাকে তো ওদের অর্ধেক পড়া হয়ে যাবে।'

—'বুঝলুম'—মুক্তি বললেন —'গাড়ি, টেনিস কোর্ট, টিউটর, সুইমিং পুল— যা যা নিজেরা দিতে পারছিস না সেই সব জিনিসের লোভে ছেলেমেয়ে দুটোকে ছাড়া গরু করে দিয়েছিস? বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক উঠে যাচ্ছে মেনে নিচ্ছিস! এরপরে হয় আপস্টার্ট নয় ভিখারির কি চাটুকারের মনোবৃত্তি হবে ওদের? বাপ-মা হয়ে সেই সর্বনাশের দিকে ওদের ঠেলছিস? ছি ছি! শত ধিক তোদের!'

তাপসী রাগ করে দুমদুম করে চলে গেল। কমলেশ মুখ লাল করে বলল, —'তাই বলে একটা সামান্য কারণে আমাদের যা নয় তাই বলে অপমান করবে?'

—'কত বড় ঝড় তোদের মাথার ওপর দিয়ে আসছে, টের পাচ্ছি বলেই বলি। ওয়ার্নিং বেল শুনতে কর্কশই লাগে। জানিস, সৌম্যর মা বাবার মিল নেই। সম্পর্ক নেই।'

—'এই কথা!' কমলেশ হো হো করে হেসে উঠল।

—'তাই বলো! মা তুমি এ যুগে একেবারে অচল, বলতে বাধ্য হচ্ছি। এই না তোমার নাতি-নাতনি তোমায় মডার্ন ঠাকুমা বলে গর্ব করে? আরে বাবা সৌম্যর মা বাবার ডিভোর্স হয়ে গেছে। তো কী? এ তো এখন আখচার হচ্ছে! ডিভোর্সড বাবা-মার সন্তানের সঙ্গে তা হলে কেউ মিশবে না? এ তোমার কেমন বিচার হলো মা? তুমি তো এতো নিষ্ঠুর ছিলে না!'

—'বেশ তো, দয়ার বিধান যদি দিতে চাস তো ওই ছেলেটাকে আন্তরিক ভাবে বাঁচাবার চেষ্টা কর না। ওর বাবা-মার অভাব যতটা পারিস পুষিয়ে দে। ও নির্ঘাৎ বয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে নিজের ছেলে-মেয়েকে ভিড়িয়ে দিয়ে ডবল সর্বনাশ করিস না।'—মুক্তি গম্ভীর মুখে বললেন।

দু চার দিন পরে মুক্তি নাতি-নাতনিকে বললেন, —'তোমরা তো প্রায়ই সৌম্যজিতের বাড়ি যাও। কই ও তো তোমাদের বাড়ি আসে না? এবার থেকে বরং ওকেই এখানে নিয়ে এসো।'

ছোটন বলল, —'দূর, এখানে অত মজা কোথায়? ওর জিম রয়েছে নিজের। টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল-টেনিস, বিলিয়ার্ডস বোর্ড পর্যন্ত রয়েছে ওদের বাড়ি, দুর্দান্ত দুর্দান্ত ভিডিও-গেমস, ফাটাফাটি সব ক্যাসেট। আমরা কত দিন কত জায়গায় বেড়াতেও তো যাই। তাজ বেঙ্গল, পার্ক হোটেল....

তাপসী-কমলেশ দুজনেই উপস্থিত ছিল। মুক্তি তাদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, —'যতই যাই থাক, তোমাদের বাড়িতেও কিছু কিছু ভালো নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া বন্ধুর বাড়ি গেলে তাকেও ফিরে ডাকতে হয়। সেটাই ভব্যতা।'

পুঁটু বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, —'সেটা ঠিক।'

ক'দিন স্কুল ফেরত ওদের সঙ্গে এলো সৌম্য। ভালো ভালো জলখাবার তৈরি করেছিলেন মুক্তি আর তাপসী। খাওয়া-দাওয়া করতে করতে তিনজনে খুব হই-চই করল। তারপর ছোটনের ঘরে গিয়ে তিনজনে কিছু গান বাজনা শুনল। একটু পরেই সৌম্য চলে গেল। বোঝা গেল তেমন জমল না।

কদিন বাদ। তারপরেই ছোটন-পুঁটু আবার নিয়মিত সৌম্যজিতের বাড়ি যেতে থাকলো।

ছোটন বলল, —'ঠাম্মা, বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা বড্ড বোর লাগে, প্লীজ।'

তাপসী বলল, —'সকাল সকাল ফিরো। রোজ রোজ এত দেরি কিসের?'

—'বাড়িটাকে কেমন ভুতুম বুড়ো লাগে, সত্যি বলছি মা। নো ফান।'

ছোটন প্রাগ করল। চলে গেলে মুক্তি বললেন, —'হল তো?'

—'কী হল?' তাপসী দমবার পাত্রী নয়।

মুক্তি বললেন, —'বাড়িটাকে যার এই বয়সেই ভুতুম বুড়ো লাগছে, আর একটু বয়স বাড়লে সে যে একেবারে পগার পার হয়ে যাবে তাপসী।'

তাপসী বলল, —'ধরে রাখতে চাইলেই কি পারবো মা। ছেলে আজকালকার দিনে কোথায় পড়াশোনা করবে, কোথায় চাকরি পাবে, দেশে অ্যাট অল থাকবে কিনা...'

—'সে তো নিশ্চয়ই'—মুক্তি আর কথা বাড়ালেন না। তারপর বললেন, —আমি একটু রথীনবাবুদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি তাহলে।'

কমলেশ-তাপসী বেঁচেছে। সন্ধ্যেবেলার দিকটা সেই থেকে মুক্তি পাড়া বেড়াতে যান। প্রতিদিনকার সেই একই তর্ক-বিতর্ক, মেজাজ খারাপ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এসব আর নেই। ছোটন পুঁটুও বেশ খুশিতে আছে। পুজোর সময়ে মুক্তি রথীনবাবুদের সঙ্গে কেদার ঘুরে এলেন।

ডিসেম্বর মাস পড়ো পড়ো। ডিসেম্বরের শেষে ছুটি নিয়ে কমলেশরা বেড়াতে যাবে। কোথায় যাওয়া হবে সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

কমলেশ বলল, —'যাক এতোদিনে মায়ের মতি ফিরেছে, তীর্থধম্মো-টম্মো করছে। আবার নাকি বেড়াতে যাবার প্ল্যান করছে। আমরা ফিরে এলেই যাবে।'

তাপসী বলল, —'ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মের বাড়াবাড়ি নেই এটা কিন্তু মায়ের একটা মস্ত গুণ, স্বীকার করতেই হবে।'

এই সময়ে বাইরে গাড়ির শব্দ হল। ছোটন আর পুঁটু ঢুকল। তাপসী বলল, —'পিয়া, ছোটন এখানে শুনে যা!' দুজন এসে দাঁড়াতে কমলেশ বলল, —'মাত্র সাতদিন ছুটি, টেনেটুনে ন'দিন করা যেতে পারে, এখন বলো কোথায় যাবে, যাতে মিনিমাম সময়ে ম্যাক্সিমাম মজা হয়। তোমাদের মা বলছে, আসাম কাজিরাঙা, শিলং। শীতে শিলং দারুণ। প্লেনে যাবো, যাতায়াতের টাইমটা বাঁচবে।'

হঠাৎ ছেলে মেয়ে দুজনেই কেমন মিইয়ে গেল। ছেলে বলল, —'তোমরা যাও না। আমাদের প্রচুর পড়াশোনা আছে। মার্চের প্রথমেই অ্যানুয়াল।'

—'সে কি রে? দুবছর পরে বেরোচ্ছি তোরা যেতে চাইছিস না?'

কমলেশ যেমনি অবাক তেমনি ক্ষুব্ধ। বলল — 'ওসব চালাকি শুনছি না। যেতে তোমাদের হবেই। ইয়ার্কি নাকি?'

এমন সময় মুক্তি ঢুকলেন। পুঁটু নাকি সুরে বলল — 'দ্যাখো না ঠাম্মা আমাদের পরীক্ষা এসে গেছে। বাবা মা এই সময়ে বেড়াতে যাবার প্ল্যান করছে। আমরা

তো তোমার কাছেই থাকতে পারি। বাবা-মা ঘুরে আসুক না!

মুক্তি সবটা শুনে বললেন —'ও। কিন্তু ওই সময়ে তো আমি তোদের রাখতে পারব না। আমার অসুবিধে আছে।'

—'কেন? কী কাজ?'

—'সে একটা আছে দরকার।'

—'বলো না কী দরকার? ছোটন-পুঁটু না-ছোড়।

তখন মুক্তি বললেন —'৩১ শে ডিসেম্বর আমি বিয়ে করছি কি না!'

—'কী বললে? কে বিয়ে করছে? —ছোটন লাফিয়ে উঠে বলল।

কমলেশ কোনও একটা প্রশ্ন করেছে কিন্তু শব্দ বেরোয় নি। মুখটা হাঁ। তাপসী অবাকেরও অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। মুক্তি বললেন —'খোকা হাঁ টা বুজিয়ে ফ্যাল। পোকা টোকা ঢুকে যাবে, একত্রিশে ডিসেম্বর আমি আর ও বাড়ির রথীনবাবু বিয়ে করছি।'

—'আপনার কি ভীমরতি হয়েছে?' তাপসীর লাল মুখটা থেকে এতোক্ষণে বেরোয়।

—'ভীমরতির কি আছে? আজকাল তো এরকম আখচার হচ্ছে। বিদেশে প্রায় কোন মহিলাই পারলে একা থাকে না। তোরা সব বিষয়ে এত আধুনিক। ডিভোর্স-টিভোর্স জলভাত মনে করিস, আর বুড়োদের বিয়েটা মেনে নিতে পারছিস না? আমরা অবশ্য নিজেদের ঠিক বুড়ো-বাতিল বলে মনে করি না। বুড়ো আবার কী?

ছোটন বলল —'ঠাম্মা তুমি বলছ কী? তোমার সঙ্গে ডাক্তারদাদুর বিয়ে? ঠাম্মাদের আবার বিয়ে হয় নাকি? আমরা যে লাফিং স্টক হয়ে যাবো পাড়ায়?'

কমলেশ বলল —'রাইট। লোকে যে হাসাহাসি করবে? কী যা তা বলছো!'

মুক্তি বললেন —'লোকে হাসবে বলে আমার যা করা দরকার মনে হচ্ছে তা করতে পাবো না? এ তো আচ্ছা জুলুম! দ্যাখ খোকা, আমার আজকাল খুব একা লাগে, রথীনবাবুরও তাই। মতেও খুব মেলে আমাদের। উনি অনেকদিন ধরেই বলছেন। আমি নাতি-নাতনিদের দায়িত্বের কথা ভেবে এতো দিন....।'

—'দোহাই তোমার', কাঁদো কাঁদো গলায় কমলেশ বলল —'তুমি যা বলবে তাই শুনবো। বুঝতে পারছি নাতি-নাতনি কাছ ছাড়া হয়ে তুমি মন মরা হয়ে গেছো। এই ছোটন, পিয়া তোরা আগের মতো ঠাম্মার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাবি। সর্বক্ষণ সৌম্য-সৌম্য কী রে?'

মুক্তি বললেন —'তুই ঠিকই ধরেছিস। নাতি-নাতনিকে মানুষ করার কাজটা

নিয়েছিলুম বলেই অন্যদিকে মন যায়নি এতদিন। কাজ, সঙ্গ এগুলো বড় জিনিস। তবে এখন ওরা আর ফিরতে পারবে না। আমার মনে হচ্ছে আজকাল ওদের জামাকাপড়ে গাঁজা-টাজার গন্ধ পাচ্ছি। সৌম্যজিত ভিডিও গেম টেনিস এসবের নেশার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগও ধরিয়ে দিয়েছে।'

তাপসী চোখ বড় বড় করে বলল —'ড্রাগ? কে ধরেছে ড্রাগ? কেন?' ছোটন তখন বন্ধ দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছন পেছন পুটু।

মুক্তি বললেন —'কেন ধরেছে? হাতে অনেক পয়সা। মা বাবা থেকেও নেই। অজস্র স্বাধীনতা, বিশাল বাড়িতে অগাধ সুযোগ..... এতগুলো যোগাযোগেও ড্রাগ ধরবে না? বিপথগামী ছেলেপুলেকে দেখলেই বয়সের চোখ চিনতে পারে। যাই হোক, আমার শক্তিতে আর কুলোবে না। এবার তোমরা ছেলে-মেয়ের বাবা-মা যা পারো করো।'

পুটুকে ফ্রকের কোণ ধরে আটকে রেখেছিল তার মা। সে ভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দরজার কাছ থেকে ছোটনকে পাকড়াও করে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর রথীন সমাদ্দার। ট্রাউজার্স আর ঢোলা শার্ট পরনে, মুখটা ভারী, কদম ছাঁট চুল, কিন্তু বেশ জব্বর একটা গোঁফ। গলাটিও বেশ ভারী। বললেন —'এই যে কমলেশ-তাপসী দুজনেই আছো তাহলে। সর্বসমক্ষেই তাহলে তোমাদের মা মুক্তি চৌধুরীকে বিবাহের প্রস্তাবটি রাখছি।'

কমলেশ রাগে তোতলা হয়ে যায়। '.... আমাদের এই দুঃসময়ে আপ্ আপনি ট্ ঠাট্টা করতে এসেছেন?'

ডাক্তারবাবু বলেন —'ঠাট্টা? বলো কি হে? আজ দশ বছর ধরে বিল যাচ্ছে পার্লামেন্টে। তর্কাতর্কি, খচাখচি, অ্যাদ্দিনে পাশ হল। কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতেই বলো, আর বি-পিতার দায়িত্ব স্বীকার করতেই বলো, আমি না হয় ছোটন পুটুকে নিয়ে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি। অবশ্য তোমাদের অনুমতি চাই। কী তাপসী? হবু-শ্বশুরই হই আর হবু-বাপই হই, অন্তত পক্ষে ফ্যামিলির ডাক্তার তো বটে। এক কাপ চা অন্তত খাওয়াবে না?'

ভর

কর্ড লাইনের ট্রেনটা সুব্রতদের যেখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সে জায়গাটার চেহারা দেখে বেশ হতাশ হবারই কথা। স্টেশন বলতে গাছের তলায় ঢালাইয়ের বেঞ্চি গোটা-দুই আর একটা টিকিটঘর। স্টেশনমাস্টার ভদ্রলোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল গোঁসাইমারি যাবার জন্যে গরুর গাড়ি মিলবে, তবে একটা ছোট নদী পেরোতে হয়। নদীতে এসময়ে হাঁটু জলের বেশি থাকে না। গরুর গাড়ি হয়ত স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যাবে। না পেলে পুরো পথ হাঁটা এবং পথ অনেকটা।

রাস্তা যাচ্ছেতাই। খানিকটা পথ গরুর গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে অবশেষে যখন অনাদির দামী ক্যামেরাটা তিন-চার বার ঠোক্কর খেল, তখন দুজনেই ঠিক করল নদী পার হবার পর ওরা হেঁটেই যাবে। তখন বেলা পড়ে যাবে, রোদের কষ্টটা থাকবে না। অসুবিধে একটাই। সুব্রত অনাদি কেউই ঠিক সুস্থ নয়। সুব্রতর স্পন্ডিলাইটিস—গলায় কলার পরা। আর অনাদির দিন সাতেক ধরে একটা গাম বয়েলের মত হয়েছে—ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছে। এটুকু শারীরিক অসুবিধেকে কি আর অফিসে পাত্তা দেয়?

সম্পাদক বীরেন মুস্তাফি সুব্রতকে ডেকে বলেছিলেন কথাটা। কর্ডলাইনে মামুদপুর স্টেশনে নেমে সাত-আট মাইল পশ্চিমে গেলে পড়বে গোঁসাইমারি গ্রাম। সেখানে নাকি এক নাপিতের ওপর ধন্বন্তরির ভর হয়। বহু দূর দূর থেকে লোক যাচ্ছে দুরারোগ্য রোগ সারাতে। সুব্রত কভার করুক ব্যাপারটা। সঙ্গে যাবে অনাদি চাটুজ্জে ফটোগ্রাফার।

এর আগে এ ধরনের দু একটা বুজরুকি সুব্রত ধরে ফেলেছে এবং তাদের

কাগজে জোরালো কলমে লিখেছে। যেমন দমদমের ব্যাপারটা—দমদমের নাগেরবাজারে দিনকতক আগে এক সাধুবাবার আবির্ভাব হয়। মাথাভর্তি লালচে জটা। মুখভর্তি গোঁফ দাড়ি। দাড়ি এসে ঠেকেছে হাঁটুতে। সাধুটি অশথতলায় বসে থাকেন আর টাকা-মাটি, মাটি-টাকা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যা থিয়োরিতে বলে গিয়েছিলেন,ইনি নাকি তার প্র্যাক্‌টিক্যাল করে দেখাচ্ছেন। এই 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' দেখতে সেখানে এত লোকের ভিড় হতে আরম্ভ করে যে রীতিমত বেটনধারী পুলিশ মোতায়েন করতে হয়। সাধুর হাতে মাটির ঢেলা দিলে সেটাকে তিনি নিমেষে একশ টাকার নোট বানিয়ে ফেলেন। আর একশ টাকার নোট দিলে সেটা মাটির ঢেলা হয়ে যায়। সুব্রতর লাগাতার অনুসন্ধানে ক্রমশ বার হয়ে পড়ল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ধাপ্পা। কয়েকজন অসাধু ব্যবসায়ী এইভাবে কালো টাকাকে সাদা করার আশায় ভণ্ড সাধুটাকে ঐখানে বসিয়েছিল। লোকটার আরেকটা ছদ্মনাম মিঃ ফক্স—একটা রং-চং মাখা উজবুক লোককে ক্লাউন বানিয়ে কদিন আগেও মফঃস্বলে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়িয়েছে।

কেসটিতে সুব্রতর খুব নাম হয়। কাগজেরও প্রেস্টিজ বাড়ে। সম্ভবত সেজন্যেই এবারেও বীরেনবাবুর সুব্রতর কথাই আগে মনে হয়েছিল।

নদীর কাছে এসে গরুর গাড়িটা ছেড়ে দিল ওরা। থেকে থেকে বালির চড়া জেগে উঠেছে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে বড় বড় গর্ত দেখা যাচ্ছে। একেই স্পন্‌ডিলাইটিস। গাড়ির নাচুনিতে হাড় কখানা খুলে না পড়ে! অনাদির দাঁতের ব্যথাটাকেও যেন আর বাগ মানানো যাচ্ছে না। ব্যাগ খুলে দু-তিনটে বড়ি বার করে মরিয়ার মত এক সঙ্গে গিলে ফেলল সে।

সরু নদী। জল যেন নেই বললেই হয়। কিন্তু যেটুকু আছে ভারি সুন্দর। সারাদিন সূর্যের তাপে সামান্য তেতে আছে। শীতের বিকেলে এতখানি পথশ্রমের পর পায়ে যেন ফুটবাথের আরাম হল। কখনো গোড়ালি জলে, কখনো হাঁটু জলে নদী পার হয়ে ওরা যখন ওপারে এসে পৌঁছল, তখন সূর্য বেশ খানিকটা হেলে পড়েছে। ওরা মনে করেছিল, পথচলতি দু'একজন লোক নিশ্চয়ই পাবে, তাদের জিজ্ঞেস করেই এগোনো যাবে। কিন্তু দেখল জিজ্ঞেস করার দরকারই নেই। রাশি রাশি গ্রাম্য লোক কোলে পুঁটুলি, কাঁখে পুঁটুলি নিয়ে ছেলেপিলেবউ সহ গোঁসাইমারির দিকে চলেছে। যেন মেলার ভিড়। এদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে নানান তথ্য জানতে পারল ওরা। ভর নাকি হয় শুক্রবার দিনে, অন্যান্য জায়গার মত শনিমঙ্গলবারে নয়। অন্যান্য দিন দীননাথ তার জাত ব্যবসা করে, সাধারণ মানুষ। ভরের সময়কার কথা তার মনেও থাকে না। বৃহস্পতিবার

মাঝরাত্তির থেকেই নাকি ব্যাপারটা শুরু হয়। তখন থেকে নাকি তার রাশই বদলে যায়। নিজের স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে অচেনার মত ব্যবহার করে। হেন রোগ নেই যা নাকি সে সারায় না, বিশেষত অস্ত্রোপ্রচার। সেটা আবার করে তার নাপিতের বাক্সের ক্ষুরকাঁচি দিয়ে। যার ওপর করা হয়, সে টের পর্যন্ত পায় না। শেষ রোগীটির চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভর বজায় থাকে। লোকজনের মনে ব্যাপারটা নিয়ে আদৌ কোনও সংশয় আছে বলে মনে হল না।

সুব্রত বলল, "এতগুলো লোক আশাভরসা নিয়ে সেখানে ছুটে যাচ্ছে। দুদিন পরে এদের সেই ভরসাটুকু গুঁড়িয়ে দিয়ে আমরা কেটে পড়ব, ভাবতে কিন্তু খুব খারাপ লাগছে অনাদিদা।"

"মিথ্যে আশা নিয়ে মরীচিকার পেছনে দৌড়নোর কোন মানে হয়?" —অনাদি বলল।

সুব্রত দুঃখিত বলায় বলল, "কিন্তু লোকগুলো কী হতদরিদ্র দেখো একবার। আশা ছাড়া ওদের জীবনে আর কী বা আছে বলো?"

"বাঃ, সেই আশাটাকে এক্সপ্লয়েট করছে ওদের চালাক জাতভাই, সেটাও ভাব! প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এইভাবে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা এক্সপ্লয়েট করে করেই তো একদলের পেট এত মোটা হল!"

সুব্রতর কী মনে হল, একটি লোককে জিজ্ঞেস করল, "কী নেন তোমাদের বাবা?"

লোকটি হাত জোড় করে সসম্ভ্রমে অদৃশ্য বাবার উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বলল, "কিছু না এজ্ঞে। ভর অবোস্তায় কেউ কিছু দিলে নাতি মেরে ফেলে দ্যান। পরে ব্যায়রাম সারলে আমরা যে যা পারি তেনার মায়ের হাতে দিয়ে আসি। কত লোকে কিছু দেয়ই না।"

অনাদি বলল,"দেখলে? কিছু নেবে না এটাও একধরনের ভাঁওতা। সবাই জানে, এতে সাপও মরবে আবাব লাঠিও ভাঙবে না।"

দুজনেই খুব খানিকটা হাসল।

গোঁসাইমারি গ্রামটা সত্যিকার অজ পাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায় তাই। জঙ্গল, ডোবা, মজাপুকুর, এবড়ো-খেবড়ো মাটির রাস্তা, হতদরিদ্র কিছু খড়ো ঘর, আরেক দিকে দিগ্‌বিসারি একুল-ওকুলহীন বিশাল এক মাঠ। এই মাঠটার ধারেই দীননাথ নাপিতের ঘর। গাঁয়ের লোকেরা চাঁদা তুলে পাশে একটা বড়সড় আটচালা বানিয়ে দিয়েছে। সেখানে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে লোকে। সবাইকে ধরেও নি—তারা বসে বা দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশে।

খবরের কাগজের লোক দেখে গ্রামবাসীরা সুব্রতদের যথেষ্ট খাতির করল। রাতের খাওয়ার জন্যে দুধ, চিঁড়ে, কলা নিয়ে এল। সঙ্গে বেশ ভাল খেজুরের গুড়। গ্রামের মোড়ল ভেতরবাড়ির দাওয়ায় ওদের শোবার ব্যবস্থা করে দিল। কিটব্যাগের ভেতর থেকে পশমী র‍্যাপার আর ফোলানো বালিশ বার করে শুয়ে পড়ল দুজনে। মোড়ল বলল সময় হলে ডেকে দেবে।

পথশ্রমের ক্লান্তিতে ওরা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনাদি আরো দুটো ব্যাথাহারী বড়ি গিলেছে। একরকম অচৈতন্য সুতরাং। মোড়লের ঠেলাঠেলিতে যখন ঘুম ভাঙল, তখন রাত নিশুত। কালির মত অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেছে। ঝিঁঝির ডাকে যেন চর্তুদিকে খত্তাল বাজছে মনে হল। ধরাচুড়ো পরেই শুয়েছিল দুই সাংবাদিক। মোড়ল বলল, "বাবার জাগার সময় হল বাবুরা, যান গিয়ে।"

আটচালা ঘরটায় টিমটিমে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। অন্ধকারের মধ্যে আরো দলাদলা অন্ধকারের মত গুটিসুটি মেরে বসে আছে লোকগুলো। এত নিস্তব্ধ সুন্‌সান চারদিক যে তাদের পায়ের শব্দ যেন দুরমুশ পেটার মত শোনাতে লাগল। একটি শিশু শুধু থেকে থেকে কেঁদে যাচ্ছে অন্ধকারের ভেতর। সুব্রত অনাদির পায়ে একটা খোঁচা দিল —"শুনতে পাচ্ছ অনাদিদা?"

দীননাথের ঘরের দিক থেকে নিশ্চুপ অন্ধকারের মধ্যে একটা মৃদু গোঙানির আওয়াজ উঠছে।

অনাদি ফিসফিস করে বলল, "এ তো হিস্টিরিয়া। আমার ছোটকাকিমার ছিল।"

"মৃগীও হতে পারে", সুব্রত বলল। "আমি একাধিক কেস দেখেছি।"

অনাদি বলল, "মৃগী হলে পিওর নিউরোলজি, আর হিস্টিরিয়া হলে সাইকিয়াট্রির কেস। তবে আমাদের আগে ধারনা ছিল, হিস্টিরিয়া মেয়েদেরই হয়।"

"না অনাদিদা। চাপা কামনাবাসনার প্রেশার এসময়ে আমাদেরই বা কী কম? প্রচণ্ড প্রেশার সবদিকে। লোকের যখন তখন নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে। স্কিজোফ্রেনিক আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া মাস-হিস্টিরিয়ার কথা ভাব। লাঠিসোটা নিয়ে গ্রামের আপাত নিরীহ লোক ডাকাত মেরে ফেলছে, ডাইনি পিটোচ্ছে, সংকীর্তনের আসরে উদ্দণ্ড নেত্য করছে। এগুলো তো বেশিরভাগই পুরুষদের কেস!"

"মাস-হিস্টিরিয়া ইজ এ ডিফারেন্ট ফেনোমেনন, সুব্রত। তার আলাদা

ব্যাখ্যা....।" বলতে বলতে অনাদি একদম চুপ হয়ে গেল।

দীনুর ঘরের দাওয়ায় একজন মানুষের শিলুয়েৎ ফুটে উঠেছে। পেছনে সাত-আটটা প্রজ্বলিত লণ্ঠন। কালো নিরেট পাথরের একটি জমাট মনুষ্যমূর্তি যেন আলো বিকিরণ করছে। লণ্ঠনগুলো পেছন থেকে সামনে চলে এল। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে একটি নিকষ কালো মাঝবয়সী মানুষ। গায়ে কালচে রঙের ফতুয়া, হেঁটো ধুতি, খালি পা। লণ্ঠনের আলো পড়ে কিনা কে জানে— চোখদুটো অন্ধকারে জ্বলছে।

আটচালার একদিকে একটা লম্বা টেবিল আর একটা নড়বড়ে চেয়ার। সেই চেয়ারে এসে বসল লোকটি। একদম শরের মত সোজা। পেছন থেকে একটা নাপিতের ক্ষৌরকর্মের বাক্স আর দু-তিন বোতল জলের মত দেখতে এবং লালচে রঙের কোনও তরল এনে রাখল দুজন লোক। একটা কেরোসিনের স্টোভের ওপর ডেকচিতে জল ফোটাচ্ছে আর একটা লোক।

কিছুক্ষণ চারদিকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখল লোকটি। তারপর হঠাৎ গমগমে গলায় হাঁক দিল, —"বাচ্চাটাকে নিয়ে আয়।" বলতে বলতে সে সন্না দিয়ে গরম জলের মধ্যে থেকে ক্ষুর তুলে নিল।

বছর পাঁচেকের একটি ছোট ছেলে সমানে কেঁদে যাচ্ছিল এতক্ষণ। তার অভিভাবক তাকে ধরে ধরে দীননাথের কাছে নিয়ে যেতেই পরিষ্কার গলায় সে বলে উঠল, —"এখুনি অপারেশন করতে হবে, শুইয়ে দে।"

এরপর একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখল সুব্রতরা। বাচ্চাটাকে সেই খোলা কাঠের টেবিলটায় শুইয়ে দেওয়া হল। একজন তার মুখের সামনে একটা কাপড়ের টুকরো ধরল। দীননাথ মুখ নিচু করে নির্নিমেষ বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ক্ষুর বাগিয়ে নিমেষে তার পেটের ডানদিকে একটু অংশ চিরে দিল। সুব্রত সভয়ে চোখ বুজল। কিছুক্ষণ পরে অনাদির খোঁচায় চোখ খুলে দেখল, ক্ষতস্থান সেলাই হচ্ছে। একটি লোক ভাঁড়ে করে কী একটা রক্তাক্ত জিনিস দাওয়ার বাইরে গিয়ে ফেলে দিয়ে এল।

সুব্রত আর থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে রুক্ষ গলায় বলে উঠল, —"এটা কী হচ্ছে? এইভাবে ক্ষুরফুর দিয়ে ছেলেটার পেট কাটলেন, যদি সেপ্‌টিক হয়ে যায়?"

লোকটি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, —"অ্যাপেনডিক্স পেকে গিয়েছিল, ফাটত। সার্জন-ডাক্তার পাব কই? বিশ মাইলের মধ্যে হাসপাতাল নাই।"

—"তাই বলে এভাবে?"

—"লাচার হলে ন্যাড়াই ভগমান। নাপ্‌তের ক্ষুরই ডাক্তারের ছুরি। তোমার ঘাড়ে কলার পরেছো কেন? ওটা স্পন্‌ডিলাইটিস নয়, ট্র্যাক্‌শন নিও না। ওটা নার্ভের।"

সুব্রত হতভম্বের মতো পেছু হটতে হটতে নিজের জায়গায় চলে এল। অনাদি বলল, —"ফেইথ-হীলারের সঙ্গে তর্করত স্কেপ্‌টিক সাংবাদিকের একটা ছবি নিলাম। দুর্দান্ত হবে।"

সুব্রত জবাব দিল না।

পরদিন রোদ উঠতে দুই বন্ধু অসীম কৌতূহল সত্ত্বেও উঠে আসতে বাধ্য হল। খিদেয় পেট জ্বলছে। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও হওয়া দরকার। ওদিকে চিকিৎসা কিন্তু সমান তালে চলছে। এইরকমই নাকি চলবে যতক্ষণ রোগী থাকে। কার আঙুলহাড়া, কার পিত্তশূল, কার গলগণ্ড—দীননাথ ওষুধ দিয়েই চলেছে, দিয়েই চলেছে।

—"নাঙ্গা পায়ে চলবে না। রবারের ঘের দেওয়া জুতো কিনে নিবে। এসব কিরমি পা ফুঁড়ে ওঠে বাবা...."

—"নাড়ি নেমে গেছে মা, তাই যন্তন্না। কাশী, পর্দা ধর্‌....."

— "হাড় ভাঙেনি, ডিসলোকেট হয়েছে। সেট করে দিই।"

—"এরে কয় টিউমার। মূলশুদ্ধু কেটে বাদ দিয়ে দেব।"

চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলায় দীননাথের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য অনর্গল।

অনাদি বলল, —"অ্যানেস্‌থেসিয়া ছাড়া কী করে অপারেশনগুলো করছে বলো তো?"

সুব্রত আস্তে আস্তে বলল, —"কী জানি। হিপ্‌নোটাইজ করে মনে হয়।"

সারাদিন ওরা গ্রামের এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়ালো। উদ্দেশ্য অজ পাড়াগাঁয়ের জীবনযাত্রা স্বচক্ষে দেখা এবং দীননাথ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। লোকটি নাকি সদর শহরের স্কুলে ক্লাস নাইন অবধি পড়েছিল। তারপর দারিদ্র্যের জন্যে পড়া ছেড়ে দিয়ে জাতব্যবসা ধরতে বাধ্য হয়।

সন্ধে হতে আবার আটচালায় এসে গুছিয়ে বসল দুজনে। দীননাথের টেবিলের যত কাছে সম্ভব। এখন রোগীর ভিড় অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। দীননাথের, চোখ ঢুলুঢুলু। হঠাৎ দেখলে মনে হয় নেশা করেছে। শেষ রোগীটি যখন প্রণিপাত করে চলে গেল, তখন ওদের ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে সাত। হঠাৎ গম্ভীর একটা ধমকের মতো আওয়াজ শুনে চমকে উঠল দুজনে। অনাদির দিকে আঙুল দীননাথ

বলছে, —"এদিকে শুনে যাও তো হে ছোকরা।"

হতবাক অনাদি শশব্যস্ত উঠে গেল। সুব্রত শুনল দীননাথ বলছে, —"পচা ঘায়ের গন্ধ পাচ্ছি। কোথায়? মাড়িতে?"

অনাদি হাঁ করল।

—"চটপট শুয়ে পড়ো। এটা ম্যালিগন্যান্ট হয়ে গেল বলে।"

সুব্রত দেখল, টেবিলের ওপর শোওয়া অনাদির হাঁয়ের মধ্যে দীননাথের ক্ষুরটা তড়িৎগতিতে ঢুকে যাচ্ছে। মিনিট কয়েক পরে সে যখন চোখ খুলল, তখন অনাদি তার পাশে বসে, চোখে কেমন একটা বিহ্বল দৃষ্টি। সুব্রতর দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল, —"কিচ্ছু টের পাইনি হে। ব্যথাটা গন!"

একটা মৃদু গোঙানির আওয়াজ। ওরা চমকে সামনের দিকে চাইল। দীননাথ আটচালার মেঝেতে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, যেন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। একটি বুড়ি মানুষ হরিনাম করতে করতে তার মুখেচোখে জল দিচ্ছে।

মোড়ল বলল, —"আসুন তো বাবুরা একবার এদিকটায়।"

দীননাথের ঘরের পেছনে সেই দুরবিসর্পী মাঠ। ফুটফুটে জোছনায় দু-চারটে লম্বা লম্বা নারকোল গাছের ছায়া শুয়ে আছে। যতদূর চোখ যায় আর কিছু নেই।

মোড়ল বলল, —"দ্যাখলেন?"

—"কী দেখবো?"

—"ধন্বন্তরি ঠাকুর গো! দীনুকে ছেড়ে ঐ যে চলে যাচ্ছেন! ঢ্যাঙা মতন, ফুটফুটে ফর্সা, খালি গায়ে পইতের গোছ..... দেখতে পেলেন নি?

চোখে জল, মোড়ল বার বার নমস্কার করতে লাগল।

কলকাতায় ফেরার সময়ে সারা রাস্তাটা প্রায় নীরবেই হেঁটেছে দুই বন্ধু। গোঁসাইমারির সীমানা যখন দিগন্তের সঙ্গে মিশে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, অনাদি বলল, —"কথাটা উড়িয়ে দিও না সুব্রত। ব্যথাটার জন্যে নিউরোলজিস্টের কাছে যাও।"

সুব্রত ধীরে ধীরে ভারী গলায় বলল, —"তা যেন হল, কিন্তু রিপোর্টটা কী দেবো অনাদিদা?"

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অনাদি আঙুল তুলে বলল, —"ঐ যে, ঐ যে তোমার রিপোর্ট।"

কাঁধে পুঁটলি, কাঁখে কচি ছেলে, মাথায় হাঁড়িকুড়ি, পরনে শতচ্ছিন্ন শাড়িধুতি, দলে দলে লোক ফিরে চলেছে। দেখলেই বোঝা যায়, পেটে অন্ন নেই, দেহে বস্ত্র নেই, মাথার ওপরে চাল নেই। যেমন-তেমন ভাবে শুধু দুটি অন্ন খুঁটে খাবার

প্রাণান্তকর চেষ্টায় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে জীবন—সেই জীবন যা নাকি অমূল্য!

দীনুর ওপর ধন্বন্তরির ভর হয়, না প্রতিভার ভর হয়, না এই মানুষগুলোর আপ্রাণ ইচ্ছাশক্তির ভর হয়—দুই সাংবাদিক ঠিক করতে পারল না।

বাজ

দুলাল দত্ত যখন তার ডালহৌসি ইস্ট-এর 'ট্রাভেল ইন্টারন্যাশানাল'-এর অফিসে ঢুকেছিল একটা বাজতে পাঁচ মিনিটে, তখন তার মেজাজ বেশ ফুরফুরেই ছিল। পার্কিং জোনে নতুন মারুতিএসটিম খানা ঢুকিয়ে বেশ সন্তোষের সঙ্গে সে গাড়িটার নীল বডিতে হাত বুলিয়েছিল। আকাশ ছিল বেশ পরিষ্কার নীল, কালো কেন সাদা মেঘের লেশমাত্র ছিল না। এমন চমৎকার দিনে একটা ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয় তার। সে-ই ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মই সে, দুটো একই কথা, পৃথিবীর যা কিছু সবকিছুর মধ্যে সে বিরাজমান, তার ইচ্ছা বিরাজমান, কিংবা আরও ভাল করে বলতে গেলে তারই জন্যে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-সুবিধে, সে দেখছে বলেই আকাশ আজ এত নীল, সে রাগ করবে বলে রাস্তায় জ্যাম ছিল না, তার চোখ জ্বালা করবে বলে বাতাস হু হু করে বয়ে বায়ুদূষণ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের একটা সুখের মৌতাতে আচ্ছন্ন সে প্রায় গুনগুন করে 'জিসকি বিবি মোটি' গেয়ে উঠেছিল এবং সুখবোধটা অক্ষুণ্ণ ছিল অফিসে ঢুকে পিওন, স্টেনো, অ্যাসিস্ট্যান্ট এদের কারও কাছ থেকে হাত কচলানি, কারও কাছ থেকে বিগলিত বেরাদরি পেয়ে।

মিনিট পনের পরে তার কিউবিকলের দরজা খুলে জবাকে ঢুকতে দেখে সে আরও উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। দুলাল দত্ত সেই জাতীয় লোক যারা বউ পেয়ে বড্ড সুখী হয়, সে বউ ধনশালিনী হলে তো কথাই নেই, বস্তুত দুলাল তার স্ত্রীর ডাউরি থেকেই (খবরদার পণ বলবেন না) সম্প্রতি অফিসটির আমূল সংস্কারসাধন করিয়েছে, এয়ার কণ্ডিশনড় অফিস এখন তার, বেশ কিছু পাতাবাহার ও আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রিন্ট শুদ্ধু খোলতাই চেহারা তার অফিসের। তা সে যাই

হোক দুলাল দত্তের মত লোকেরা এই জাতীয় বউ পেলে সুখী। শালী পেলে আরও সুখী। কাজেই ব্লু-জিন্‌স ও আলগা টপ পরা টপ-নটেড হাই-হিল শালী যখন ফ্রস্টেড টেরাকোটা ঠোঁটের অকৃপণ হাসি নিয়ে ঢুকে এল, তার ব্রহ্মানন্দে কোনও চিড় ধরেনি।

—আরে, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম বল তো? জবা দুলাল দত্তের পিসতুতো মাসতুতো শালী। তার ওপর আঁতেল শালী মডেল শালী দুর্দান্ত মড। এই ধরনের শালীরা তাদের প্রতি মনোযোগী হলে দুলালের মত জামাইবাবুদের ইউফোরিয়া আরও বেড়ে যায়।

জবা বলল—'কার আবার, যে লাকি ভদ্রমহিলার মুখ দেখে রোজ ওঠেন!' তার ফ্রস্টেড ঠোঁট একটু স্ফুরিত বুঝি বা।

সাধারণত পুরুষদেরই 'লাকি গাই' বলা হয়ে থাকে। তার স্ত্রীকে লাকি বলায় দুলাল হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। সে তালে তাল রাখতে বলে —'তা তোমাকে আর পাচ্ছি কোথায় বল, তাই অগত্যা সেই ভদ্রমহিলারই মুখ....।' জবা ভ্রূভঙ্গি করে।

—'যা মুখে আসে তাই বলছেন একা পেয়ে, না?'

—'তা এমন ডবকা শালীর সঙ্গে একটু ফস্টি-নস্টি না করলে আর লাইফ কী?'

—'একা পেয়ে যা খুশি করবেন, একা পেয়ে যা খুশি বলবেন, এরকম করলে কিন্তু আমি আর আসব না।'

—'আরে আরে রাগ করলে তোমায় যা দারুণ দেখায় না!' এই পুরুষীয় উক্তি আজকাল বস্তাপচা হয়ে গিয়ে থাকলেও দুলাল এর বাইরে যাবার প্রতিভা দেখাতে পারে না।

—'তা ব্যাপারটা কী বল তো? আজকে হঠাৎ অধীনকে স্মরণ করলে?'

—'একটা উপকার করবেন দুলালদা! যাব পার্ক হোটেলে, একটা পার্টির সঙ্গে অ্যাপো আছে, একটু পৌঁছে দেবেন?'

—'এই রে মুশকিল করলে! আমি তো এইমাত্র অফিসে ঢুকছি। বহু কাজ পেণ্ডিং রয়েছে।'

বলতে বলতেই ফোন বাজতে লাগল। সেটা নামিয়ে রেখে দিতেই আবার একটা।

'দেখলে তো?—আমার এখন নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই। এখান থেকে পার্ক হোটেল কতটুকু। তুমি একটা স্মার্ট মড ইয়ং লেডি, হেঁটে মেরে দাও! কিংবা একটা ট্যাক্সি ধরে—।'

—'এইভাবে যে পার্ক হোটেলে যাওয়া যায় সে জ্ঞান আমার আছে দুলালদা, চলি।'

জবা উঠে দাঁড়াল।

—'এ কী! এক কাপ কফি খেয়ে যাও! রাগ করলে না কি?' জবার মুখ আহত। সে কোনও কথা বলছে না। পেছন ফিরছে, এবার চলে যাবে।

—'রাগ করো না জবা। আচ্ছা একটু বসো, আমি কটা কাজ সেরে নিই।' জবা দরজাটা টেনে ধরে বেরিয়ে গেল।

ঝটিতি বাজার টেপে দুলাল দত্ত।

পিওন উঁকি দেয়।

—'ওই দিদিকে চট করে একটু আসতে বলো তো!'

অফিসের বাইরে থেকে জবাকে ডেকে নিয়ে আসে হাবুল পিওন।

—নীরবে সামনে বসে আছে জবা।

—'পাঁচ মিনিট বসো প্লিজ।' নীরবে বসে থাকে জবা।

পাঁচ মিনিটে কোনও কাজ হয় না। তিন পাঁচে পনেরো মিনিট লাগল। হাবুল পিওন, প্রীতিশ স্টেনো, অ্যাসিস্টেন্ট মনোজ ও বান্টি দেখল, দুলাল দত্ত বেরিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে একটি মড মেয়ে। দুলালের মুখে গলমান হাসি, মেয়েটির মুখ গম্ভীর।

শ্বশুরবাড়ির মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষরা বরাবরই একটু দুর্বল! শালী, শালাজ, ইত্যাদেত্যাদি। বাপের বাড়ির (ছেলেদের বিয়ে হলে তাদেরও কিন্তু একটা বাপের বাড়ি হয়) মেয়েরা সব বোন-পিসতুতো, মাসতুতো, জাঠতুতো, খুড়তুতো এবং বৌদি অথচ শ্বশুর বাড়ির সেই একই মেয়েরা শালী শালাজ অভিধায় ভূষিত হয়ে একটা অতিরিক্ত গ্ল্যামার এবং সেক্স অ্যাপিল সংগ্রহ করে থাকে। বাঙালি সমাজের অদ্যাবধি ঘোমটা টানা পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যঞ্জনাময় সম্পর্কের স্বাদই আলাদা। এই যৌন আবেদনকে গ্যালান্ট্রি নামক ভাঙ্গ দ্বারা অভিনন্দিত করতেই হয়, করেও বেশিরভাগ জামাই। দুলাল দত্ত, বালাই ষাট, কোনও ব্যাতিক্রমী জামাই চরিত্রই নয়। সুতরাং পার্ক হোটেলে গিয়ে যখন দেখা গেল জবার অ্যাপয়েন্টী আসেনি বা এসে চলে গেছে তখন জবার থমথমে ব্লাশার শোভিত মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে দুলালকে বলতেই হয় —'লাঞ্চ করেছো?'

—'আমি লাঞ্চ করি না।'

—'করো, আজকে করবে।'

অতএব পার্ক হোটেলের অভ্যন্তরে জবার মানভঞ্জন হয়ে যায়।

ঘটনাটা এই পর্যন্তই।

কিন্তু জবা যদি আসতেই থাকে? আসতেই থাকে? সে নানা ব্যাপারেই দুলালদার পরামর্শ চায়, সাহায্য চায়। সেগুলো দিতে করতে দুলালের কোনও অসুবিধে হয় না। অফিসের পর যদি জবা তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে জোর করে? দুলাল যদি অনুরোধ এড়াতে না পেরে যায়? জবার যেন একটা অধিকার জন্মে যাচ্ছে দুলাল দত্তর ওপর। তাই না! জবার জন্মদিনে নিমন্ত্রিত দুলাল দত্ত। না তেমন অনুষ্ঠানিক ব্যাপার কিছু নয়। সামান্য কজন। সেরকম ব্যাপার হলে তো মুন্নি-দিকে বলতোই। জাস্ট একবার অফিস ফেরত ঘুরে যাবেন। জবার ভাল লাগবে তাহলে। জবার মায়েরও। বিশেষ করে বলে দিয়েছেন উনি। কিন্তু আসল ক্ষেত্রে দেখা গেল জবার মা নির্লিপ্ত, উদাস,—'ভাল আছো বাবা? এসো,' বলে তিনি সেই যে আপন কাজে গেলেন আর দেখা নেই। এদিকে জবার ঘরে ধূপ, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মালা, ক্যাসেটে 'তুমি কিছু দিয়ে যাও', জবার চোখের কাজল যেন একটু ধেবড়ে গেছে, পরনে আজ বাঙালি সাজ, জবার চুল যথেষ্ট। আজ যেন ফুলে ফেঁপে সব ভাসিয়ে নেবে। এবং অন্য কেউ নেই।

কিন্তু জবা কথা বলছে না কেন? দুলাল দত্তর একটু দেরি হয়ে গেছে ঠিকই।

—'কী ব্যাপার তোমার বন্ধু বান্ধব সব চলে গেল না কী?' জবা একবার চোখ তুলে তাকাল। ব্যাস। কথা বলল না।

কিছুক্ষণ বসে বসে গান শোনে দুলাল দত্ত। জবার মা খাবার এনে দিলেন। গাঙ্গুরামের রাধাবল্লভী-আলুরদম, বাঞ্ছারামের সন্দেশ, ক্যাথলিনরামের পেস্ট্রি। গান শুনতে শুনতে দুলাল খায়।

—'কী হল জবা, রাগটা কেন বলবে তো?' জবা কোনও কথা বলে না। চুলগুলো কপাল থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। উঠে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের গলার মালাটা ঠিকঠাক করে দেয়। যেন সে তার জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের গলাতেই মালা দিচ্ছে দুলাল দত্তকে উপেক্ষা করে।

চা-টা জবা নিজেই এনে দিল। একই রকম নীরব। এইবার দুলাল দত্তের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। নিমন্ত্রণকারী তার সামনে মুখভার করে বসে থাকবে আর সে গপগপ করে খাবে-এ আবার কী? সে খেতে এসেছে না কী? সে উঠে পড়ে —'চলি জবা।'

এইবার জবা স্ফুরিতাধরে চুল লুটিয়ে আঁচল লুটিয়ে বাইরের দরজা রোধ করে দাঁড়ায়।

—'এ আবার কী?'

—'বলেছিলে এলাম। খেলাম। এবার চলে যাচ্ছি।'

—'না আগে ফয়সালা হয়ে যাক।'

—'কিসের ফয়সালা? কী ব্যাপার?'

—'দুলালদা অনেকদিন আমাকে ইউজ করেছেন, আজকে একটা ফয়সালা চাই।'

—'হোয়াট ডু ইউ মিন? ননসেন্স। রাবিশ।'

দুলাল দত্ত এবার যাবেই। কিন্তু জবা অচল-অটল দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। দুলাল যার পর নাই বিরক্ত। কয়েকবার সরতে বলে অবশেষে সে জবার একটা হাত দরজার পাল্লা থেকে সরাবার চেষ্টা করে।

জবা সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পার্শ্ববর্তী কৌচে পড়ে যায়। দুলাল অনুতপ্ত, কিন্তু অবাকও। কী করে যে জবার এতটা ধাক্কা লাগল সে বুঝে উঠতে পারে না। যাই হোক সে বলে—'আরে লাগল না কি? সে নিচু হয়ে জবাকে তুলতে যায়। জবা তাকে অবিশ্বাস্য জোরে পেছন দিকে ঠেলে দেয়। টাল সামলাতে জবাকেই ধরে দুলাল। এবং হুমড়ি খেয়ে জবার ওপর পড়ে যায়।

—'ছিঃ ছিঃ'—জবার মা ভেতরের দিকের দরজার সামনে।

—'আরে দেখুন তো মাসিমা, জবার কাণ্ড!'—অপ্রস্তুত দুলাল উঠে দাঁড়াচ্ছে।

এখন যদি জবার মা দাবি জানান, দুলালের ব্যাপার যখন এই রকমই তখন সে জবাকে বিয়ে করুক, অবশ্যই তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী সুনীতাকে খারিজ করে, তা হলে দুলাল দত্ত কী করবে?

—'শুনুন মাসিমা এসব আপনি কী বলছেন? জবা আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ওকে সরাতে গেছি তাই.....

—'আমি কোনও কথাই শুনতে চাই না, ছিঃ ছিঃ। আবার সাফাই গাইছো? জবা তোমাকে আমি শেষ কথা শুনিয়ে দিলাম, সুনীতাকে আমি আজই ফোন করছি।'

—'আটকাও, আটকাও জবা।' আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে দুলাল। যেতে যেতে জবা বলে যায়—'আজ না হয় আটকালাম, কিন্তু এর পর?'

দুলাল আর কোনও কথা বলে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালিয়ে দেয়। মেয়েদের ছলা-কলা, মুড-মুডভঙ্গ এসবের সঙ্গে আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালির মতই অর পরিচয় কম। চমৎকার একটি মনের মত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে, আশাতিরিক্ত যৌতুক পেয়ে সে খুব সপ্রতিভ, ফস্টিনস্টিতে অভিজ্ঞ জামাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়েছিল মাত্র। বিয়ের প্রথম সাতদিনের আদি-রসাত্মক পরিবেশে

একাধিক শ্যালিকার সঙ্গে সে ইয়ার্কি দিয়েছে। প্রত্যেককেই বুঝতে দিয়েছে, জামাইবাবু দুলালদা দারুণ মাই ডিয়ার লোক, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে, খাওয়াতে কার্পণ্য নেই। জবা শালীটি তাকে চন্দনের ফোঁটায় সাজিয়ে দেয়। এবং অতটা কাছে আসার সুবাদে আলাপ তারই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জমে যায়।

—'দেখবো দেখবো পরে আমায় চিনতে পারেন কি না।'

—'এর পরে দেখা হলে হয়ত আমায় পাত্তাই দেবেন না,' ইত্যাকার চ্যালেঞ্জ সে দুলালকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেই সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেই দুলাল অতটা নমনীয় হয়েছিল।

এখন গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে 'ইউজ' কথাটা ইলেট্রিক শব্দের মত ধাক্কা মারতে থাকে। 'ইউজ' কথাটার 'ইউসেজ' জবা নামে মেয়েটি জেনে বুঝে করেছে? না আলগা ভাবে কথাটা লোফালুফি করছিল মাত্র। সত্যিই সে মেয়েটিকে কিছু 'আইডিয়া' দিয়েছে না কি? সর্বনাশ! শ্বশুরবাড়িতে চন্দন পরাবার সময়ে দু-একবার ঠাট্টা করে বলেছিল বটে, —'বড্ড কাছে চলে আসছ কিন্তু! দেব না কি কামড়ে?'

দু-একবার গালে আদরের ঠোনাও মেরেছিল। এ সব থেকে মেয়েটা কি কিছু ভেবে নিয়েছে? এ তো আচ্ছা বুরবক?

বাড়ি ফিরে দুলাল তার বউকে চুমু খেতে ভুলে গেল। উপরন্তু ব্যস্ত উদভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে বসল—'কোনও ফোন এসেছিল?'

—'তোমার না আমার'?— বউ জিজ্ঞেস করে। তার মুখ শীতল।

এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দুলাল দিতে পারে না।

বলি বলি করেও আজকের ঘটনাটা বউকে বলতে পারে না।

কেন না, আগের ঘটনা গুলোও তো সে বলে নি!

সারাদিনের কাজে কর্মে সব মোলাকাৎগুলোর কথাই সে ভুলে গিয়েছিল। পরে মনে পড়লেও বলবার মত কোনও ঘটনা বলে মনে হয় নি।

আজকে জন্মদিনের নিমন্ত্রণের কথাও সে বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিল।

ফুল-ওয়ালার দোকান থেকে একগুচ্ছ ফুল পাঠাবার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিল। সাউথ-ইস্টার্নের পি.আর.ও-র সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। সেখানেই খানিকটা দেরি হয়ে যায়। তারপর সে বাড়িই ফিরে আসছিল। ওয়েলিংটনে ঢুকে পড়ে। তখন আবার ট্রাফিক লাইট। জ্যাম এবং ওয়ান ওয়ের বাধা কাটিয়ে ভবানীপুরের পথ ধরে।

যে নেমন্তন্নের কথা বউকে বলতেই ভুলে গেছে সেই নেমন্তন্নে গিয়ে একটা

অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে এ কথা বললে বউ যদি এখন ভুল বোঝে?

একমাত্র রাত্তিরে খেতে বসে সে অনেক চেষ্টা করে সহজ হয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে—'আচ্ছা, তোমার ওই জবা নামে কাজিনটি কি রকম মেয়ে বলো তো?'

—'হঠাৎ জবা? কেন? পছন্দ?'—বউ বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। মুখে হাসি। শ্লেষের? না ঈর্ষার? না রাগের?—সর্বনাশ।

—'এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। মাঝে মাঝে আমার অফিসে এসে উদয় হয় কি না।'

—'তাই না কি? জবাদের সঙ্গে আমাদের তেমন মাখামাখি কোনদিনই নেই। তা যদি বলো, খুব ভাল সাজাতে টাজাতে পারে। বিয়ের সময় ও-ই তো আমাকে সাজাল। তবে খুব করিৎকর্মা মেয়ে। ফিল্মটিল্ম বানাচ্ছে আজকাল। সেই সূত্রে ওর বহু চেনা। অনেক জায়গায় ঘোরাফেরা.....তা তোমার অফিসে এসেছিল কেন?'

—'ওই ও পাড়ায় এসেছিল দেখা করে গেল আর কি!'

পার্ক হোটেলে নিয়ে যাবার অনুরোধ ইত্যাদি ইত্যাদি বিশদ তথ্য দিতে দুলাল কেন যেন সাহস পেল না আর।

বউ বলল—'ও'। দুলাল জানতো-ই না জবা তেমন গুরুত্বপূর্ণ শালী নয়।

দিন তিনেক পরে ট্রাভল ইন্টারন্যাশনালে আবার দেখা যায় জবাকে। আজ সালোয়ার-কামিজ, মুখে ঘাম। ব্যস্ত সমস্ত।

মনোজ আর বান্টি চোখাচোখি করে।

হাবুল প্রীতিশের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায়।

জবা বলে—'দুলালদা, কী করি বলুন তো! মাকে আর সামলাতে পারছি না।'

—'ওঁকে বুঝিয়ে বলেছো ব্যাপারটা?'

—'বুঝতে চাইছে না।' ওড়নার খুঁট ধরে আঙুলে জড়াতে থাকে।

দুলাল ওর দিকে আতঙ্কিত হয়ে চেয়ে থাকে। এ কি উড়ো বিপদ। রাগ ঠেলে ওঠে মাথায়।

সে বলে—'তুমিই বা ওরকম অদ্ভুত আচরণ করলে কেন?'

—'বাঃ ফুল পাঠিয়ে দিলেন সকালে, সন্ধেয় আসেনই না আসেনই না। মিতা, সুপর্ণা, সুজিতরা বলল "কেমন জামাইবাবু তোর? অ্যাতো ফর্মাল! ধুর!" আমার মন খারাপ হয়ে গেল।'

যাক, তা হলে জবার রাগের কোনও না কোনও কারণ আছে। যত হাস্যকরই

হোক। মেয়েদের ব্যাপার! এবং এই স্বস্তিতে যুক্তিতে দুলাল দত্ত সেই অদ্ভুত 'ইউজ' শব্দটার ব্যবহারের মানেটা জেনে নিতে ভুলে যায়।

—'একমাত্র উপায় মাকে কিছুদিন এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, বুঝলেন? কিছুদিন বেড়াতে গেলে মা ব্যাপারটা ভুলে যাবে। জেদটাও ভুলে যাবে।'

গুড আইডিয়া,দুলাল দত্ত মনে মনে বলে।

'দেখি কিছু টাকার যোগাড় করতে পারি কি না, লেটেস্ট ফিল্মটাতে সব টাকাকড়ি আটকে আছে কিনা! ওটা সেল হয়ে গেলেই আর চিন্তা ছিল না।'

জবা উঠে পড়ে।

দুলাল দত্তর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কথাগুলো—'কত টাকার দরকার এখন?'

—'কেন আপনি দেবেন?' জবা ঘুরে দাঁড়িয়েছে—

—'মাথা খারাপ?'

—এক্ষুনি যদি দরকার থাকে দেওয়াই তো যায়!'

—'হাউ ডেয়ার য়্যু' জবার চোখ জ্বলছে। জবার মান অপমান বোধ খুব তীক্ষ্ণ।

সেই দিনই বাড়ি ফিরে খবরটা শোনে দুলাল।

সুনীতা বলে —'আরতি মাসি ফোন করেছিলেন হঠাৎ।'

—'আরতি মাসি কে?'

—'ওই যে জবা! জবার মা। আমাদের বাড়ি একদিন আসতে চাইছেন। পরের হপ্তায়।'

'কেন?'—দুলালের স্বরটা ফ্যাঁসফেঁসে শোনায়।

'আমার মনে হয় জবার ব্যাপারে।'

'জবার আবার কী ব্যাপার?' দুলাল বলছে কিন্তু কথাগুলো প্রায় শোনাই যাচ্ছে না।

'মেয়ের বিয়ে নিয়ে তো সব মায়েরই চিন্তা থাকে। আমার নতুন বিয়ে হয়েছে। একগাদা বরযাত্রী দেখেছেন। দেখো, কাউকে হয়তো ওঁর পছন্দ হয়েছে।'

দুলাল জানে তা নয়।

পরের দিন সে পাগলের মত ফোন করে। ফোনটা জবারই ঘরে। আশা করা যায় সে-ই ধরবে।

—'হ্যাললো—'

—'জবা আমি দুলালদা বলছি।'

—'বলুন।'

—'শোনো তোমাদের দুজনের প্লেনের টিকিট কেটে দিচ্ছি। নেপাল ঘুরে এসো। খরচ-খরচার জন্যে যা দরকার হবে আমি বেয়ার করবো। দ্য হোল থিং ইজ অন মী। বুঝলে?'

— ও দিকে নীরবতা।

—'কী হল শুনছো?'

—'শুনছি।'

—'আপনার কথাগুলো আবার বলুন।'

—'তুমি মাকে নিয়ে নেপাল ঘুরে এসো। পুরো খরচটাই আমি বেয়ার করবো।'

—'কেন?'

—'কেন আবার কী? ইটস মাই প্লেজার।'

—'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে দুলালদা? লোকে কী মনে করবে বলুন তো?'

—'লোকে জানছে কোত্থেকে?'

—'আমি তো জানছি!'

—'বলছি তো তোমরা একটু আনন্দ করে এলে আমার ভাল লাগবে।'

—'ঠিক আছে। আপনার যখন এতোই ইচ্ছে।'

এই টেলিফোন সংলাপের টেপটাই দুলাল দত্তকে শোনাচ্ছে এখন তার স্ত্রী সুনীতা। সুনীতা হিন্দি ফিল্মের ভাষায় মা বননেওয়ালি এখন। শরীর খুব খারাপ। মানসিক অবস্থার কথা বলা বাহুল্য। তার এক চোখে আগুন আর এক চোখে জল।

'তুমি মাকে নিয়ে নেপাল ঘুরে এসো। পুরো খরচটাই আমি বেয়ার করবো।'

—'কেন?'

—'কেন আবার কী? ইটস মাই প্লেজার।'

—'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে দুলালদা? লোকে কী মনে করবে বলুন তো?'

—'লোকে জানছে কোত্থেকে?'

—'আমি তো জানছি।'

—'বলছি তো, তোমরা একটু আনন্দ করে এলে আমার ভাল লাগবে।'

কথা বলতে পারছে না সুনীতা, শুধু জল আর আগুন ঝরাচ্ছে। কথা বলতে

পারছে না দুলালও।

—'কোথা থেকে পেলে এটা?'

—'সেটা জানার কী দরকার?'

—'যে যা খুশি পাঠিয়ে দেবে, তুমি সেগুলো বিশ্বাস করবে। হা-হুতাশ করবে, রাগারাগি করবে?'

—'বেশ তো তুমি বলো না, এটা তোমার গলা নয়। তুমি বলো না, তুমি মাসি আর জবাকে নেপালে নিজের খরচে বেড়াতে পাঠাও নি।'

সাধারণ মানুষের মিথ্যে কথা বলতে একটু প্রস্তুতির দরকার হয়। দুলাল সাধারণ মানুষ। তারও মিথ্যে কথার জন্য একটু প্রস্তুতি দরকার ছিল।

স্ত্রী যখন মেঝেতে মাথা ঠুকতে থাকে, না জেনে শুনে একটা লোচ্চাকে বিয়ে করে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে বলে, তখন দুলালের চৈতন্য ফেরে। সে আসলে ভাবছিল, জবা তাদের টেলিফোন সংলাপটা টেপ করেছে কেন? এটা তো স্বাভাবিক আচরণ নয়? এবং এখন ভেবে দেখতে গেলে, জবার কোনও আচরণটাই স্বাভাবিক নয়।

সে হঠাৎ খুব তৎপর হয়ে ওঠে। স্ত্রীকে যথাসাধ্য গায়ের জোরে মেঝেতে মাথা ঠোকা থেকে নিরস্ত করে।

'আমাকে ছোঁবে না'—এই মেয়েলি উক্তি বস্তা পচা হয়ে গিয়ে থাকলেও সুনীতা এর বাইরে যাবার প্রতিভা দেখাতে পারে না। দুলাল খুব খাপছাড়া ভাবে বলে ওঠে —'তুমি সেদিন বলছিলে—ওদের বাড়িটা নাকি জবা-ই করেছে! সে কোথা থেকে এত টাকা পেল?—

সুনীতা বলল —'তুমি পাও কোথা থেকে এতো টাকা মিসট্রেসকে তার মায়ের সঙ্গে নেপাল বেড়িয়ে আসতে দেবার জন্যে?'

মিসট্রেস কথায় প্রচণ্ড ধাক্কা খায় দুলাল, সুনীতার বাপের বাড়ির নৈতিক চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ আপত্তিকর কথা বলে। জবাও তো সেই বাপের বাড়িরই প্রোডাক্ট!

এই কুৎসিত ঝগড়ার বিশদ বিবরণে গিয়ে কাজ নেই। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলায় কেউই কম গেল না। এবং দুলাল দত্তের মনে যে সঙ্গত এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি উঠেছিল, অর্থাৎ জবা কেন টেলিফোন সংলাপ টেপ করে, সে প্রশ্নটির গভীরে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। যে ঝড় তারপর চলতে থাকে, তার মধ্যে শান্তভাবে স্ত্রীকে বোঝানোর সমস্ত সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যায়। সমস্ত রকম আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কুটুম্ব-বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে

দুলালের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। অশান্ত অসুখী আতঙ্ক ও হিস্টিরিয়াগ্রস্ত সুনীতা অসময়ে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে এ পৃথিবীর মায়া কাটায়।

দুলাল এখন জানে না সে বেঁচে আছে কি না, এবং যদি থেকে থাকে তো কেন।

কলেজস্ট্রিট কফিহাউসে সৌমিত্র সাধারণত যায় না। কিন্তু ঋত্বিক যখন একটা ডকু-ফিল্ম করছে কলেজস্ট্রিট পাড়ার ওপর এবং তার ধারাভাষ্য পড়বার ভার যখন সৌমিত্ররই, তখন তাকে যেতে হয়েছে। বিশেষত ওই ধারাভাষ্যটি যখন সে-ই লিখবে। এ গুলো সৌমিত্রর নেশা। ফিল্মের ওপর তার যথেষ্ট পড়াশুনো। মাঝে মাঝে এ কাগজের ও কাগজের হয়ে সে ফিল্ম, নাটক, ইত্যাদি কভার করেও থাকে। পেশায় সে এঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক। সবে ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরেছে। ফিরেই ঋত্বিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে। ঋত্বিক তার স্কুলের বন্ধু। রাজধানী এক্সপ্রেসের পুরো একটা কোচ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-যাত্রী কলকাত্তাই ফিল্মওয়ালাতে ভরে গেছে।

দিনটা মেঘলা। চাপা গরম। এপ্রিলের ভ্যাপসায় রাজধানী এক্সপ্রেস-এর ভেতরে এখন আইসক্রিম আরাম। পশুপতিনাথের মন্দির ও তার পুরোহিতের বংশ নিয়ে একটা ডকুফিল্ম করেছে জবা। সেটা নিয়েই এবারের দিল্লি যাত্রা। জাতীয় ফিল্ম উৎসবে প্রচারমূলক ছবির একটা প্রতিযোগিতাও আছে। আবার মাণ্ডি হাউসেও ছবিটা নিয়ে একটা অ্যাওয়ার্ড যদি মেরে দিতে পারে তাহলে বিক্রির অসুবিধে থাকবে না। দূরদর্শনে একটা প্রাইম টাইম স্লট তার চাই-ই চাই। চুলগুলো গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত পার্ম করে নিয়েছে জবা। জিনস আর টাইট টপ পরা। চোখেতে বেশ ঘন করে কাজল দিয়েছে। নাকে একটা রিং। সেক্সি সেক্সি লুকটা এখন খাচ্ছে খুব। ঋচীকাদিকে নিয়ে গিয়েছিল কাঠমাণ্ডুতে। বদলে ঋচীকাদি স্ক্রিপ্টটাও করে দিয়েছে। রৌণক ক্যামেরা হ্যাণ্ডল করে ভাল। এডিটিং-ও এবং গ্রাফিকস্-ও সে-ই করেছে। সাক্ষাতকারগুলো নিয়েছে জবা নিজে। ঋচীকাদির স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী। ভাষ্যের জন্য একটা ভাল গলা দরকার ছিল। একজন শখের আবৃত্তিকারকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া গেছে। বিক্রি হলে রৌণককে তার ওয়ান ফোর্থ শেয়ার দিয়ে যা থাকবে তাতে এবার একটা গাড়ি হয়ে যাবে জবার। গাড়িটা থাকলে অনেক সুবিধে।

গাড়ির মেনটেনান্সের কথাটা অবশ্যই ভাবতে হয়। থোক কিছু দরকার। হঠাৎ শিহরণ খেলে যায় তার সারা শরীরে। এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি তার উল্টোদিকে

একটা যুবক বসে মন দিয়ে 'আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস' পড়ছে। হাতে খুব দামী ঘড়ি। লাগেজটা উঁকি মারছে তলা থেকে— এস চ্যাটার্জী। বিদেশী মনে হচ্ছে। পড়ুয়া গোছের ছেলে। চব্বিশ ঘণ্টা যারা বইয়ে মুখ ঢেকে বসে থাকে। কে এ ছেলেটি? কী এর পেশা? জবা তার নিজের অভিজ্ঞতার বিশ্বকোষের পাতা উল্টোয়। নাঃ এ ছেলে ফিল্ম লাইনের নয়। এ ডাক্তার নয়। ডাক্তারদের আবহে একটা অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ থাকে। সার্জন হলে হাতগুলো হয় ফুলের মত। এর হাতগুলো শক্তপোক্ত। কোন পেশায় এত সময় এবং নিশ্চিন্ততা থাকবে, যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাবে 'আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস' পড়তে পড়তে? পোড় খাওয়া ফিল্ম সমালোচক নয় সেক্ষেত্রে এ বইটা আগেই পড়া থাকত।

যদি বিদেশে থাকে অর্থাৎ এন. আর.আই হয় তাহলে ভাল আর যদি সদ্য বিদেশ-প্রত্যাগত হয় তাহলে আরও ভাল।

জবা চোখ শানায়, ডানা মোড়ে, থাবার মধ্যে থেকে বক্র নখ বার করে।

'এক্সকিউজ মি, আপনিই কি সেই বিখ্যাত এস চ্যাটার্জি যিনি মুঘল আর্কিটেকচারের ওপর ফ্যানটাসটিক ডকুটা বানিয়েছেন? ইস্‌স, আপনি পড়ছিলেন, আমি.....আ য়্যাম সো সরি।'

—আমি কোনও বিখ্যাত এস চ্যাটার্জি নই। সামান্য সৌমিত্র চ্যাটার্জি। বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াই। নমস্কার।'

—জবা ঝাঁপ দিয়েছে।

সেই লোকটা

লোকটাকে সে প্রথম খেয়াল করে হুগলির ডি. আই অফিসে। আগেও দেখেছে। কিন্তু সে ভাবে লক্ষ্য করেনি।

বাবা স্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন পাঁচ বছর হয়ে গেল। কিছুই হাতে পাননি। না পেনশন, না গ্র্যাচুয়িটি, না জি. পি. এফ। কোনটার কাগজপত্র রেডি হয়নি, কোনটার ফাইল হারিয়ে গেছে। কোনটা আবার ট্রেজারি রিলিজ করছে না। বাবা বললেন —'দুটো বর্গের জ-ই আমার ক্ষয়ে গেল রে...জুতো আর জীবন। এবার তুই দ্যাখ যদি পারিস।'

তা সেই তার বাবার কর্মক্ষেত্রের গোলকধাঁধায় প্রথম প্রবেশ। পাঁচ বছর সময় যতটা কম মনে হয়, ততটা কম নয় দেখা গেল। কেননা বাবার কর্মক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। বাবার সময়ের হেডমাস্টারমশাই রিটায়ার করেছেন। সেই সময়কার ক্লার্ক মারা গেছেন। কাগজপত্র সাত বাঁও জলে। বর্তমান ক্লার্কের কাছে বর্তমান হেডমাস্টারমশাই যেদিন তাকে চতুর্থবার পাঠালেন সেদিন ক্লার্ক কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছিলেন। বললেন —'পেন্ডিং কাজ যে করব ইনসেনটিভ কই?'

এখন, কাজ কখন পেন্ডিং হয়? যখন তোমরা তাকে পেন্ডিং রাখো, তাই না? তো তার আবার ইনসেনটিভ কী? —সে এইভাবে ভাবল। কিন্তু সে একটু ভিতু প্রকৃতির। উপরন্তু খুব বুঝদার। সবসময়ে অন্যের কথা ভেবে কাজ করার অভ্যাস। তাই সে দ্বিতীয় চিন্তা করল—সত্যিই। এঁদেরও তো বাঁধা সময় আছে। তার বাইরে কাজ করতে গেলে সেটা অন্যত্র হলে ওভারটাইম হত। আগের ক্লার্ক যে কাজ ফেলে রেখে বে-আক্কেলের মতো মারা গেলেন, তার জন্যে বেশি সময়

খরচ করার কী দায় এঁর পড়েছে! হলই বা এটা সত্তর বছরের এক বৃদ্ধের গ্রাসাচ্ছাদনের মরণ বাঁচনের ব্যাপার।

স্কুল লাভ-ক্ষতির কারবার করে না, সে ইনসেনটিভ দেবে কোত্থেকে? পঞ্চম দিনে সুতরাং সে এক বাক্স নলেন গুড়ের ভাল সন্দেশ নিয়ে গেল। ইনসেনটিভ নয় এটা। কিন্তু তার আগাম খুশি আগাম কৃতজ্ঞতা সত্যিই ভারী কৃতজ্ঞ হয়ে জানিয়ে রাখছে সে—পেনসনেপ্সু পিতার কৃতজ্ঞ ছেলে।

কাগজপত্র নড়েছে সংবাদ পেয়ে সে যখন বিজয়গর্বে বেড়িয়ে আসছে তখন বাবার স্কুলের দরজার পাশ দিয়ে কালোমতো কে একটা যেন সরে গেল। গেল তো গেল, সে খেয়াল করেনি।

তারপর সে জানল তাকে ডি. আই অফিসে ধরনা দিতে হবে। কেননা সতেরো বছর আগের প্রাপ্য একটা ইনক্রিমেন্ট নাকি যোগ করা হয়নি, ভুলভাল হয়ে গেছে।

ডি আই অফিসের রঙচটা বাড়িটাকে মাঠের মাঝখানে হেঁপো রুগির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তার মনটা দমে গিয়েছিল। করিডর দিয়ে যেতে যেতে সে দু পাশের ঘরে ফাইলের পাহাড় এবং ধুলো লক্ষ্য করে। এবং সেই লোকটাকে করিডরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কাজটা তার দু তিনবার হাঁটাহাঁটি করার পর হয়ে যায়। অবশ্য 'ইনসেনটিভ' লাগে।

এইভাবে অবশেষে সে বাবার পেনশন উদ্ধার করে যেদিন বাড়ি ফিরছে, তার মনে হল কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। পকেটে পাঁচ টাকা তিরিশ পয়সার খুচরো এবং একঠোঙা কাবুলিমটর—সে খুব ভালবাসে, পায়ে শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া ঝ্যালঝেলে হাওয়াই চটি, দু দিনের বাসি দাড়ি গালে এবং ছোটভাইয়ের চেকশার্ট আর নিজের ব্লু জিনস তার পরনে, তার ভয় করার কিছু ছিল না, তবু সে নির্জন গলিগুলো এড়িয়ে যায়। একটা রাস্তা বাঁক ফেরবার মুখে কায়দা করে সে পেছনের লোকটাকে দেখেও নেয়। ওহ্! তেমন কেউ না। সে আশঙ্কা করেছিল শার্টের কলার-তোলা, চোয়াড়ে-মুখে ব্রণ, মিঠুন-ছাঁটের চুল-ওয়ালা সাইকেলের চেন হাতে, ভোজালি-পকেটে কোনও মস্তানকে দেখবে। সে সব নয়। সেই লোকটা। যে ডি. আই. অফিসের করিডরের এক কোণায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, এবং যে খুব সম্ভব বাবার স্কুলের দরজার পাশ দিয়েও সড়াৎ করে সরে গিয়েছিল।

এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, একটা নতুন শোনা জীবনমুখী গান ভাঁজতে ভাঁজতে বাকি পথটা দিব্যি হেঁটে মেরে দেয়, হাওয়াই চপ্পলটা মাঝরাস্তায় জবাব

দিলেও সে কিছু মনে করে না।

লোকটাকে সে দ্বিতীয়/তৃতীয়বার দেখে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে। তার মায়ের যেবার অ্যাকসিডেন্ট হল সেই বার। তাদের আসলে একটা বাড়ি আছে। দেড়কাঠা জমিতে ঠাকুর্দা একতলা করেছিলেন। বাবা উদয়াস্ত কোচিং করে করে সারা জীবন ধরে দোতলাটা তোলেন, কিন্তু ছাদের পাঁচিলটা আর শেষ করতে পারেননি। তিন ইঞ্চি ইঁটের যে নিচু গাঁথনিটা পাঁচিলের জায়গায় ছিল, পলেস্তারা পড়েনি বলেও বটে, সিমেন্টে মাটি মেশানো ছিল বলেও বটে, সে গাঁথনিটা কমজোরি হয়ে গিয়েছিল, ভেতরে ভেতরে আলগা হয়ে গিয়েছিল। যেমন হয় আর কি! হবি তো হ, তার মা আলসে থেকে তাঁর একটা উড়ে-পড়ে যাওয়া গোলাপি ব্লাউজ ঝুঁকে তুলতে যান। তাঁর মত অতবড় বেকার ছেলের মায়ের গোলাপি ব্লাউজের ওপর ঝোঁকের বে-আক্কেলেমিতেই হোক আর যা-ই হোক, পাঁচিলটি ধসে যায়, ফলে মা পড়ে যান, যে ঘটনাটুকু নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলা যায়, 'একটি গোলাপি ব্লাউজের জন্যে' নাম দিয়ে।

মাকে সে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারছিল না। ডাক্তারবাবুরা, বেশ ইয়ং ছেলে সব, এই বয়সেই এত অ্যাকসিডেন্ট আর মৃত্যু দেখেছেন যে কারো রক্তাক্ত থেঁতলানো দেহ নিয়ে তাঁরা খুব ব্যস্ত না হয়ে প্রচুর কাজের ফাঁকে একটু মৃদু ফস্টিনস্টি করে নিচ্ছিলেন, এবং যে নার্সটির সঙ্গে করছিলেন না তার মেজাজ খাট্টা হয়ে গিয়েছিল। এমত সময়ে সেই লোকটাকে নজর করে সে। একদম অপরিচিত প্রাণীদের চিড়িয়াখানায় একটিমাত্র চেনা মুখ দেখে সে হয়তো অসহায় চোখে তাকিয়েছিল, লোকটি এগিয়ে আসে। হাত পাতে, সে তার কাছে যা ছিল দিয়ে দেয় এবং তার মা ভর্তি হয়ে যান।

তবে তারপরে হয় আর এক ফ্যাচাং। দেখা যায় কম্মো কাবার। মা এতটা ধৈর্য ধরেননি, বিরক্ত হয়েই হয়তো বালতিতে লাথি মেরেছেন। ডাক্তারবাবুরা ভীষণ নিয়ম মানেন, তাঁরা জানেন একটা লাশকে এনে যদি কেউ চিকিৎসার দাবি করে, সেই দাবিকে সন্দেহের চোখে দেখা ডাক্তারবাবুদের কর্তব্য। আগে লাশ বানিয়ে তারপর তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে কি না এ সন্দেহ নিরসন করতে ময়নাতদন্ত করতে হবে।

মা আর মা রইলেন না, ঝামেলায়-ফাঁসানো এক লাশ হয়ে গেলেন, তো সেই লাশ ছাড়াতে যখন সে ডোমেদের সঙ্গে দরাদরি করতে থাকে, সে এ সব জানে না বলে বন্ধুজনদের তার বোকামিতে মজা পাওয়া হাসি শুনতে শুনতে, তখন সেই লোকটাকে তৃতীয়/চতুর্থবার সে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে মুশকিল

আসান হয়ে যাবে। ঠিক তাই। চারশো থেকে দু'শোয় নেমে যায় ডোম। তার মড়াখেকো চেহারা দেখেই হয়তো এবং সেই দু'শো টাকা বন্ধুবান্ধবদের পকেট থেকে আপাতত উধার পাওয়া যায়।

এখন এই লোকটিকে যদি সে দেবদূত বলে মনের মধ্যে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রাখে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? যাদের বাবারা এই রকম পেনশন পান না, ঠাকুর্দারা বাড়ি শেষ করে যেতে পারেন না, মায়েরা গোলাপি ব্লাউজ তুলতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মারা যান এবং মর্গে চালান হয়ে যান তাদের জীবনে একটা দেবদূতের কি দরকার হয় না? একটা দেবদূত কত কাজে লাগে বলুন তো? সাহস দিতে, মুশকিল আসান করতে, ভরসা জাগাতে, জীবনটা সবটাই বরবাদ নয়—তার ভেতর কিছু একটা নেই-নেই করেও আছে এই বোধ উসকে দিতে একটা দেবদূত বড্ড কাজে লাগে। তারও লেগেছিল।

কিন্তু মানুষের ধর্মবিশ্বাস বড্ডই প্রয়োজননির্ভর। তাই এত কাণ্ডের পরেও সে দেবদূতকে ভুলে যায়। দেবদূতের প্রয়োজনটা পর্যন্ত ভুলে যায়। কেন না তার ভাববার সময় ছিল না। মা মারা যাওয়ার ফলে সে রান্না করতে এবং তার ছোট ভাই কাপড় কাচতে বাধ্য হওয়ায়, বাবা শোকগ্রস্ত জরাগ্রস্ত ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ায়, জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির বনিবনা না হওয়ায়, একটি মেয়ে শুদ্ধু দিদি এসে পড়ায়, দিদির খোরপোষের জন্য মামলা করতে টিউশানির সব টাকাগুলি উকিলকে গ্যাঁটগচ্চা দিতে হওয়ায়, একটি রামবোকা ছাত্রী তার প্রেমে পড়ার কারণে ছাত্রীর দাদার ভাড়া করা গুণ্ডাদের হাতে ঠ্যাঙানি খাওয়ায় সে ডাইনে বাঁয়ে তাকাবার অবসর পায়নি। কোনও কল্পনা, কোনও স্বপ্ন, আশা-নিরাশার দোদুলদোলা এ সব তার অভিধান থেকে বেমালুম লোপাট হয়ে যায়।

সে অথৈ নদীর জলে পড়ে গেছে। সাঁতারের স জানে না, কিন্তু তাকে বাঁচতেই হবে সুতরাং সে যেমন পারে হাত পা ছোঁড়ে, ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেসে থাকতে শিখে যায়, শুধু ভেসে থাকা, নদীতে জোয়ার আসলে সে একদিকে হড়কে যায়, আবার ভাটার সময়ে আরেক দিকে হড়কে যায়, এই সময়ে আবার ভরা কোটালে বান আসে। তিনতলা সমান উঁচু জলস্তম্ভ তাকে তুঙ্গে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দেয়, তারপরে সে অদূরে ঘূর্ণিপাক দেখে, প্রাণপণে বিপরীত দিকে টানতে থাকে নিজেকে। কাজেই তার দেখা হয় না কোথাও কোনও কোণে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি নেই।

তবে এইভাবে আনাড়ি সাঁতার দিতে দিতে সে একটা কুটো পেয়ে যায়। কুটো নয়, কেরোসিন কাঠের টুকরো, কেরোসিন কাঠের টুকরো নয়, ভাঙা নৌকো,

আগে থাকতে জেনে শুনেও সে সেই ভাঙা নৌকোয়ই চড়ে, সেটি একটি বোবা মেয়ে যার বুদ্ধি আছে এবং টাকাও কিছু আছে।

এইবারে সে খুব সাবধানে, খুব যত্নে কিছু বিকিকিনি শুরু করে। সস্তায় কেনে, একটু বেশি দামে বেচে। ঘুরে ঘুরে প্রাণপাত করে, কোথায় কোন জিনিস একটু সস্তায় মেলে, কোথায় কোন জিনিসের অগাধ চাহিদা, খোঁজ খবর করে সেই খোঁজখবরকে কাজে লাগায়। এদিকে জামাইবাবুর কাছ থেকে দিদিও তার মেয়ের জন্যে একটা চলনসই খোরপোষ মেলে, বাবা শয্যায় মারা গিয়ে তাকে মুক্তি দেন, ছোট ভাই এক ইয়ুথ কয়্যার-এ ভিড়ে গিয়ে এখানে ওখানে কল শোতে মেতে থাকে এবং খুব একটা রোজগারপাতি না হলেও ভারী খুশি মেজাজে থাকে। সে বাড়িটা সারায়, বাড়ির পাঁচিল তোলে, স্নো-সেমের রঙ লাগায় বাড়িতে, তার পরে বিয়ের পাঁচ বছর পরে হনিমুনে যায়। বেশি দূরে কোথাও নয়। দীঘায়।

সমুদ্র দেখবি তো গোয়ায় যা। সুন্দরী সুন্দরী সী বীচ। মিরামার, কালাংগুটে, কোলবা সব একেক জন একেক রকম সেজে বসে আছে। ঘুরে আয় মুম্বই, সমুদ্রটা তেমন কিছু না হলেও, লঞ্চে চেপে এলিফ্যান্টাটা সেরে আসা যায়। কিম্বা চলে যা কন্যাকুমারিকায়। তিন দিক থেকে কেমন তিন রঙের সমুদ্র মিশেছে দেখতে পাবি, দেখতে পাবি ওই সিন্ধুর টিপ বিবেকানন্দ দ্বীপ, দেখবি কুমারী দেবী কেমন অনন্ত প্রতীক্ষায় থমকে রয়েছেন। যেতে পারা যায় চেন্নাইয়ের দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভে, পণ্ডিচেরির সবুজ সমুদ্রে। শ্রী অরবিন্দ আশ্রমটাও দেখা হয়ে যাবে। আচ্ছা অতদূর না-ই হল, গোপালপুর? চাঁদিপুর? নিদেনপক্ষে পুরী? পুরীতে তো তামাম বাঙালিস্তানের লোক হনিমুন করতে যাচ্ছে। তা না দীঘা।

তা তা-ই সই। পুকুরের মতো নিথর টাইপের সেই সমুদ্দুরে লম্বা ফেনার গুড়িমারা বেঁটে ব্রেকার দেখেই তার বোবা স্ত্রী আনন্দে নাচতে থাকে। তার চোখ ভরে যায়। মন ভরে যায়। গলার কাছে একটা ব্যথা ডেলা পাকায়। আহা, বাবা দেখতে পেল না, মাটা গোলাপি ব্লাউজ তুলতে গিয়ে খামোখা মারা গেল! আহা দিদিটা? দিদিটার মধু-যামিনীর সুখ হল না জীবনে। দিদির মেয়েটার হবে তো? হবে হবে নিশ্চয়ই হবে। সে তো চেষ্টা করছে প্রাণপণে। বোবা বউ তার বড় লক্ষ্মী। এই শান্ত দীঘার মধুযামিনীকেই সে আনজুনার জৌলুসের জোয়ার দেবে।

গা ভর্তি শান্তি মেখে সে ফিরে আসে। দিদি দরজা খুলে দেয়, ভাই হাত থেকে সুটকেস নেয়, হাঁড়ি ভর্তি মিষ্টি সে দিদির মেয়ের পিতৃহীন হাতদুটিতে তুলে দিতে পেরে বড্ড আরাম অনুভব করে। দিদি বলে—'তোর সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। আর এক দিনও ঘুরে গেছেন। বোধহয় খুব

দরকার....।'

তার তথাকথিত বৈঠকখানায় ঢোকে সে। বাবার পুরনো তক্তপোষের পাশে তার নতুন কেনা সোফায় বসে আছে—সেই লোকটা। এতদিনে সে লক্ষ্য করে লোকটা ঠিক কালো নয়, কেমন কালিময়, ঠিক মোটা নয়, কেমন ফোলা ফোলা, জুলফি বেয়ে কাঁচা কলপ ঘামে গলে নেমে এসেছে। সিনথেটিকের জামায় আটকে পড়া ঘামের দুর্গন্ধে সমস্ত ঘরটা নাক কুঁচকে ছোট হয়ে আছে, তবু সে টের পাচ্ছে না। লোকটা বলল—'আমি বুঝলেন, আয়কর অফিসে আছি। আপনার যা কাগজপত্র দেখলুম ওরা ইচ্ছে করলেই কেসে ফাঁসাতে পারে। না, না তেমন কিছু না। আমি তো রয়েছি। বিজনেস ব্যাপারটা আসলে.... না না সেসব কিছু নয়....' বলতে বলতে তার বাঁ পকেটের পাশ থেকে লোকটা ছোট্ট করে হাত বাড়াল।

এখন সে কী করবে? কি করতে পারে সে? খুব বেশি ভাববার সময় নেই। প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও দ্রুত চিন্তা করতে হচ্ছে। তিনটে বিকল্প আছে মোট। এক লোকটাকে খুন করা। সে ক্ষেত্রে তার ফ্যামিলি ভেসে যাবে; দুই নিজেকে খুন করা, সে ক্ষেত্রেও তার ফ্যামিলি ভেসে যাবে। সে অতএব তৃতীয় বিকল্পটা নিল।

হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে সে
লোকটার ভেতর
ঢুকে গেল।

গৃধ্রকূট

বোধগয়া থেকে ছেষট্টি কিলোমিটারের মত অ্যামবাসাডরে। তিনটি জাপযুবক, একটি বাঙালি দম্পতি। জাপানীদের তীর্থযাত্রা, দম্পতির মধুচন্দ্রিমা। বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উঁদয়গিরি, শৈলগিরিতে ঘেরা পাঁচ পাহাড়ি এই বৌদ্ধ তীর্থে দু ধরনের যাত্রা কী অনায়াসে মিলে যায়!

ডিসেম্বরের দাঁত-কাপানো কুয়াশার ভেতর থেকে রোদ-ঝলমলে সকাল আস্তে আস্তে ফুটে বেরোচ্ছে। নরম রোদ। শালুক ফুলের মত নম্র, নরম।

পাঁচজনের মধ্যে অন্তত চারজন কী রকম একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। বুদ্ধে বুদ্ধে ছয়লাপ। তিব্বতি বুদ্ধ, চিনা বুদ্ধ, থাই বুদ্ধ, নেপালি বুদ্ধ, ভুটানি বুদ্ধ, আর জাপানি বুদ্ধ মন্দিরের সেই আকাশচুম্বী বুদ্ধমূর্তি!

বুলা জন্মেছে জুরিখে। এক পৃথিবীচর পরিবারের মেয়ে সে। বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় কত যে ঘুরেছে! ভারতবর্ষ তো বটেই, ভারতের বাইরেও।

—'নৈনিতাল, রানিক্ষেত, কৌশানি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কুলু-মানালি-চম্বা?'

—'হ্যাঁ।'

—'মুসৌরি-দেরাদুন!'

—'কতবার।'

—'পূর্ণিমায় তাজমহল, মার্বল রক্‌স।'

—'অবশ্যই।'

—'অজন্তা-ইলোরা-ঔরঙ্গাবাদ-গোয়া?'

—'সব। সব।'

সবই বুলার যাওয়া, দেখা, কোনও কোনওটা একাধিকবার। অমন যে বিশাল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি—তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ তার দেখা।

'তাহলে তো তোমাকে হংকং নিয়ে যেতে হয়।'

—'হংকং তো বাজার-নগরী। বিয়ের বাজার তো ওখান থেকেই করলাম। না হলে তোমার নাইকন ক্যামেরা, লেটেস্ট মডেলের রোলেক্স ঘড়ি, অ্যামস্টারডামের হিরের আংটি, সার্জিও ভ্যালেনটাইনোর শেভিং কিট, ম্যানিকিওর সেট কোথা থেকে আসত!'

—'তবে কি সুইজারল্যান্ড? সে তো আমার ক্ষমতায় আর ইহজীবনে কুলোবে না।'

এই জায়গায় বুলা সতর্ক হয়ে যায়। ইচ্ছা প্রকাশ করলে যে বাবা সুইজারল্যান্ডের ব্যবস্থাটাও করে দিতে পারেন এ কথাটা কি বলা যায়? এতে তো কুমারেশের অমর্যাদা। কুমারেশের হলে অমর্যাদাটা তারও হয়। এই কথাটুকু ধনীর দুলালী হলেও সে মোক্ষম বোঝে। মলম-মাখানো গলায় সে বলে—'আহা! সুইজারল্যান্ড কেন? অরোরা বেরিয়ালিস দেখতে নিয়ে যাওয়াও হয়তো একদিন তোমার হাতের পাঁচ হয়ে দাঁড়াবে! কে বলতে পারে?'

—'নাঃ'—কুমারেশ মনমরা গলায় বলে।

কেন যে ও ওরকম নঞর্থক চিন্তা করে? বুলা তো সমানেই উৎসাহ দিয়ে যায়!

সে অগত্যা বলে—'দূর, জায়গাটা সুন্দর হলেই হল। আর নতুন। নতুন হলেই ভাল হয়। ব্যস।'

বিদেশী ইলেট্রনিক্স গুডস-এর লোক্যাল এজেন্ট কুমারেশকে তার বিয়ে করার কথাই নয়।

এ নিয়ে অশান্তি কি কম হয়েছে?

একটা স্ট্রোকের পর বাবা এখন অবসর নিয়েছেন। একটু বেশিই দুশ্চিন্তা করেন। বলেছিলেন—'কী পরিচয় ওর আমি দেব?'

মা বলেছিলেন —'আহা, এম.কম ডিগ্রিটা তো আছে? উদ্যমী হলে ওইখান থেকেই ও উন্নতি করবে। আমি ও দিকটা ভাবছি না। ছেলেটার আপনজন বলে কেউ নেই! কুটুম বলে কিছু থাকবে না?'

—'ওটা একটা কথা হল? যত আপনার জন থাকবে ততই কমপ্লিকেশন বাড়বে। আপনার জন তো আমরাই হতে পারি। ছেলে তো বড় বংশেরই।

হাটখোলার দৌহিত্র বংশ। কিন্তু আসল যে উদ্যমের কথা বললে, সেটাই ছেলেটার নেই। লোক তো কম চরালাম না জীবনে! আমরা বুঝতে পারি।'

—'একশোবার, মা বলেছিলেন, তবে এ কথাও সত্যি যে মেয়েকে যদি কাছে রাখতে চাও তো এর চেয়ে ভাল পাত্র পাওয়া শক্ত। স্বাস্থ্য ভাল, চেহারা তো রূপকথার রাজপুত্র!'

—'ওই দেখেই তো বুলাটা ভুলেছে।'

বুলার সামনেই আলোচনা হচ্ছিল। সে এই সময়ে ফোঁস করে ওঠে —'তুমি ভোলনি? মা ভোলেনি? "কী চমৎকার কথাবার্তা! রাজপুত্রের মত চেহারা!" —বলোনি?'

—'তা বোধহয় বলে ফেলেছি, আবছাভাবে হলেও মনে পড়ছে'—বাবা স্বীকার করেছিলেন। মা স্মিত মুখে চুপ।

—'তবে? দোকানদার শুনেই চুপসে গেলে?'—বুলা বেশ চোখা চোখা কথা ব্যবহার করতে ভালবাসে।

বাবা হেসে ফেলেন —'সত্যিই তোর এত পছন্দ? হাবুডুবু খাচ্ছিস? না কী?

—'খাচ্ছিই তো!'

—'আর ও? ও কী খাচ্ছে?'

—'ও বিষম খাচ্ছে। বলছে কোনওদিন যদি উন্নতি করতে পারে, আ চেন অফ শো রুমস ইন অল দা বিগ সিটিজ অফ ইন্ডিয়া, সে দিনই ও আমাকে প্রোপোজ করার কথা ভাবতে পারে!'

—'কথাটা তো ঠিকই বলেছে। কাণ্ডজ্ঞানটা তাহলে আছে।'

—'হয়তো বম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজ, সরি মুম্বই, দিল্লি, চেন্নাইয়ে দোকান-শৃঙ্খল ওর হবে বাবা। তবে তখন আর আমি বিবাহযোগ্য থাকব না। আমিও তখন তোমারই মত রিটায়ার্ড।'

মেয়ের কথার ধরনে বাবা-মা হেসে ফেলেছিলেন। একমাত্র সন্তান, কত আদরের। তার কথা কি শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারেন?

তা জামাই দেখে সব ধন্য-ধন্যই করেছিল। বুলাও খুব জ্বলজ্বলে চেহারার মেয়ে। দু তিন পুরুষে ধনীর ঘরে যেমন হয়। ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, চোখা নাক। কিন্তু কুমারেশের রূপ একেবারে অন্য গোত্রের।

বেড়াতে বেরোতে ওদের একটু দেরিই হয়ে গেল। প্রথমত কুমারেশ তার বিয়ের যৌতুকে-পাওয়া ল্যান্সডাউনের শো রুমটা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয়ত প্রচণ্ড গরম। ডিসেম্বরের গোড়া এখন। যখন দেখা গেল ভারতের সব বিখ্যাত

রূপমহলই বুলার দেখা, তখন কুমারেশ এই চমৎকার ভ্রমণসূচীটি তার মাথা থেকে বার করে।

—'গিরিডি গিয়েছো? ফুলডুংরি? রাজরাপ্পা? রাজগির?'

এত কাছে, অথচ বুলা যায়নি। সুতরাং সব ঠিকঠাক করে গর্বিত হাসি হেসে কুমারেশ বলে —'চলো যাই বিহারে।'

নির্জনতার খোঁজে সে তার বউকে নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব রোমাঞ্চকর জায়গায় ঘুরবে। বুনো ঝোরার ধারে ছিন্নমস্তার মন্দির, শাল-মহুয়া-পলাশ-পাইনের জঙ্গলে ছাওয়া ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট যেখানে ভালুকের ভয় আর সূর্যোদয়ের রোমাঞ্চ দুটোই সমান উপভোগের, পাহাড়ের ঢালে পাখির কলকাকলিতে ভরা নিঃসঙ্গ লেক....

কিন্তু আশ্চর্য কথা উশ্রী ফল্‌সে ওরা অভীষ্ট নির্জনতা পেলই না। ফল্‌সটাকে ঘিরে কত যে পিকনিক পার্টি! কত যে রকম-বেরকমের পোজ আর সেই সঙ্গে ক্যাসেটের কী যে মস্তানি! তবে কুমারেশের মত গোমড়া মুখে বুলা বসে থাকেনি। সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পিকনিক পার্টিদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে, উশ্রীর এলোচুলের ধারায় চান করে যথাসম্ভব মজা করে নিয়েছে। উশ্রী বড় ভয়ঙ্করী। ওখানে চান-টান করা বিপজ্জনক। ওরা দেখেছিল সেই স্পটটা যেখান থেকে পা ফসকে পড়ে বোল্ডারের পর বোল্ডারে ধাক্কা খেতে খেতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেসে গিয়েছিল একটি বেপরোয়া ছেলে মাত্র মাস তিনেক আগে।

তবু বুলা তাকে নামিয়েছিল, নিজে তো নেমেছিলই। একবার নামবার পর কুমারেশেরও নেশা ধরে গিয়েছিল। আর একটা, আরও একটা পাথরে যাবার জন্য ছটফট করছিল সে।

এই সময়ে একজন পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে —'অনেক হয়েছে দাদা, খুব বীরপুরুষ আপনি, আর এগোলে নিজে যদি বাঁচেনও, বধূ-হত্যার দায়ে পড়বেন নির্ঘাত!'

কুমারেশ ভয় পেয়ে যায় —'প্লিজ বুলা এবার ফেরো।'

'ওঃ, তুমি এত ভিতু!' বুলা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

কিন্তু বুদ্ধগয়ার সেই অশোকের-আরম্ভ-করা কানিংহামের শেষ করা মন্দির, শ্রীলঙ্কা থেকে আনা বোধিবৃক্ষের ছায়া আর আকাশছোঁয়া বুদ্ধমূর্তি দেখে ও কেমন ঘোরে আছে। জাপানি ছেলেগুলির মধ্যে তোসিকোই একমাত্র একটু ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারে, দু'দিন বোধগয়ার আই.টি.ডি.সি-র হোটেল অশোকে থাকাকালীন বুলা ওর কাছ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে অনেক জাপানি জ্ঞান সঞ্চয়

করছিল এবং ওকে ভারতীয় তথ্য দিচ্ছিল।

—'ওই দেখো ওই গৃধ্রকূট'—ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলল বুলা।

ড্রাইভার বলল —'বহি গৃধ্রকূট, মেমসাবনে ঠিক বোলি।'

—'তুমি চিনলে কী করে?'—কুমারেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। বুলা হাতটা মাছি ওড়াবার ভঙ্গিতে নেড়ে বলল —'দেখলেই তো বোঝা যায়। শকুনের পিঠের ঢালটা তার পর মাথার গোল আর বাঁকানো ঠোঁটের শেপ দেখলেই চিনতে পারা যায়। লম্বা গলাটা নেই।'

তোসিকোদের যতই দেখায় সে, তারা চিনতে পারে না, কুমারেশ তো নয়ই।

রাজগিরের টুরিস্ট বাংলোয় বুকিং ছিল। পা দিয়েই কুমারেশ খুশি হয়ে উঠল। সারা দোতলাটায় এক বৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়ান দম্পতি ছাড়া কেউ নেই। জাপানি তিনজন নীচে। ব্যাস।

—'এই নাও তোমার নির্জনতা,' কুমারেশ হেসে উঠল।

—'আমার নির্জনতা মানে? লোকজন হই-চই আমার সবসময়ে ভাল লাগে। নির্জনতাটা তোমারই বেশি দরকার মনে হচ্ছে। এমন করছ যেন কোনওদিন আর আমাকে একা পাবে না।'

ভ্রূভঙ্গি করে বুলা কুমারেশের কাছে ঘেঁষে আসে। তার মাথা কুমারেশের কাঁধ ছাড়িয়ে, মুখটা উঁচু করে সে আয়নার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে —'দেখো দেখো!'

—'আসল তোমাকে দেখব, না তোমার ছায়া দেখব?'

—'আমাকেও না, আমার ছায়াও না, খাজুরাহোর ওই মিথুন-মূর্তি দেখো আয়নার বুকে।'

এমন একটা মুগ্ধ আকুলতার সঙ্গে সে কথাগুলো বলে যেন সত্যিই কোনও শিল্পকৃতি দেখছে, যেন এক দম্পতির ক্ষণ-মিলনের দৃশ্য থেকে সত্যিই সে শাশ্বত মিথুনের কোনও দর্শনে পৌঁছে গেছে।

—'মনে হচ্ছে না আমরা অনেক আগের যুগে ফিরে গেছি?' বলতে বলতে শিউরে ওঠে বুলা।

....'রাজগৃহ থেকে রাজগির। রাজগিরের পথে-পথে পায়ে-পায়ে ইতিহাস।' গাইড বলছিল, 'অজাতশত্রু রাজা এই শহরের নাম দেন গিরিব্রজ।'

—'না তো!' বুলা বলে, 'গিরিব্রজই আগেকার নাম। জরাসন্ধের সময়ে মানে মহাভারতের কালেই গিরিব্রজ নাম ছিল। রাজগৃহ নাম তো বিম্বিসারের সময় থেকেই।'

জাপানিদের সে বুঝিয়ে দেয়। ওরা পাঁচজনে এই গাইডের শরণ নিয়েছে।

—'এই হল অজাতশত্রুর দুর্গ' পথের আশে-পাশে ভগ্ন প্রাচীন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে গাইড বলে।

—'না তো। অজাতশত্রুর দুর্গটা পাটলিপুত্রে মানে পাটনায়। বৈশালীর ঠিক উল্টো দিকে স্ট্রাটেজিক পয়েন্টে দুর্গটা করেন অজাতশত্রু। এ দুর্গ তো মহারাজ বিম্বিসারের করা। অজাতশত্রু তাতে হয়ত কিছু যোগ করেন।'

—'ইউ সিম তু নো লত্ হিসত্রি?' তোসিকো শ্রদ্ধার চোখে তাকায়—

—'ইউ স্তাদি?'

বুলা হেসে মাথা নাড়তে থাকে। না না, সে কিছুই জানে না। ক'টা কথা বলেছে বলেই এরা তাকে পণ্ডিত ঠাউরে নিয়েছে।

—'মূল রাস্তা তো দুটো? ওমা ওই তো বেণুবন, ঢুকব না আমরা?' সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

গোছা গোছা বাঁশগাছ ফোয়ারার মতো আকার নিয়ে ওপরে ঠেলে উঠছে, ঠিক, ওটাই বেণুবন।

—'তবে যে বললে রাজগিরে আগে আসোনি?' কুমারেশ জিজ্ঞেস করে।

—'আসিনিই তো।'

—'বুকলেটটা এত ভাল করে পড়েছ যে....'

—'হয়তো পড়েছি। হয় তো পড়িনি'.... মুখে রহস্য মেখে কুমারেশের দিকে তাকায় বুলা।

মস্ত বড় ফলকের ওপর বেণুবনের পরিচয় লেখা।

"এই বেণুবন বা বেলুবন ছিল লর্ড বুড্ঢাকে মহারাজ বিম্বিসারের প্রথম উপহার। জীবনের বারোটি বছর বেণুবনে দেশনা করেন লর্ড বুড্ঢা। অনুপম সৌন্দর্যের জন্য বেণুবন ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়।"

—'বাঁশগাছগুলো গোছা গোছা করে লাগিয়ে মন্দ দেখাচ্ছে না অবশ্য। কিন্তু এমন কী সৌন্দর্য আছে এর, বুঝলাম না'—কুমারেশ বলে।

—'তুমি কী মনে করেছ শুধু বাঁশগাছ দিয়ে বেণুবন সাজানো ছিল? বেণুর সৌন্দর্য অনুভব করে বিম্বিসারের বনবিভাগ বেণুর একটু প্রাচুর্যই রেখেছিলেন অবশ্য। কিন্তু আরও বহুরকম গাছ ছিল এ বাগানে। ফুলের তো সীমাসংখ্যা নেই। এত সুন্দর ছিল এ বাগান যে বিম্বিসার তাঁর এক রানী ক্ষেমাদেবীকে বেণুবনের সৌন্দর্য দেখাবার ছল করেই বুদ্ধ দর্শনে নিয়ে এসেছিলেন।

—'কেন? ছল করে কেন?—কুমারেশও বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছে।

—'রানী ক্ষেমা যে গোড়ার দিকে বুদ্ধের ওপর হাড়ে চটা ছিলেন। ওই রানীই এই বেণুবনে বুদ্ধকে প্রথম দেখবার পর এমনই প্রভাবিত হন যে প্রবজ্যাই নিয়ে ফেলেন। এই যে এইখানে রানী ক্ষেমার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের প্রথম দেখা হয়েছিল।'—নাটকীয়ভাবে বুলা একটা অশথ গাছের দিকে আঙুল দেখায়।

সে মিটিমিটি হাসছে। সেদিকে তাকিয়ে তোসিকো বলল —'ক্রু? অর নো ক্রু?'

কুমারেশ বলল —'শি'জ জাস্ট কিডিং।'

—'কিদিং? কিদিং?'—ওরা তিনজনেই তিরস্কারের চোখে বুলার দিকে তাকাল।

পরে কুমারেশ বুলাকে সাবধান করে দেয় —'দেখো, ওরা কিন্তু বৌদ্ধ। বুদ্ধকে ওরা ভগবান বলে মানে। ওদের সামনে ওভাবে বুদ্ধকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা কোরো না।'

—'তুমিই তো ঠাট্টার কথা বললে! আমি তো ঠাট্টা করিনি!' বুলা অবাক হয়ে বলল, একটু পরে বলল —'আমি যদি বলি ওইখানেই সেই স্পট যেখানে ক্ষেমা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথমে দেখেছিলেন বুদ্ধকে, এর বিপক্ষে তুমি কোনও প্রমাণ দিতে পারবে?'

—'আড়াই হাজার বছর আগে কোথায় কী ঘটেছিল সে প্রমাণ আবার কেউ দিতে পারে না কি?' কুমারেশ বলল বেশ অবজ্ঞার সঙ্গেই।

—'প্রমাণ না পেলে আর ইতিহাস রচনা হচ্ছে কী করে?'

—'তা অবশ্য। কিন্তু বুলা, তুমি যে বৌদ্ধযুগের ইতিহাস এত জানো সেটা আমি জানতাম না।'

'জানিই তো!'

জেদি মেয়ের মতো বুলা বলে —'ধরো যদি বলি আজ যেখানে এই ট্যুরিস্ট বাংলো সেইখানেই বিম্বিসার রাজামশাইয়ের কোষাধ্যক্ষর কোয়ার্টার্স ছিল। যদি বলি এইখান দিয়ে, এই করিডর দিয়ে নুপূরের নিক্কণ তুলে আমি হেঁটে যেতাম তখন গরবিনীর মতো!' বুলা তার নুপূর মেঝেতে ঠুকে ঠুকে বাজায়। ছুন ছুন ছুন শব্দ হয়। —'যদি বলি এক ভীষণ দস্যি আবদেরে মেয়ে ছিলাম আমি, বাবা-মা আমাকে সামলাতে পারতেন না। যখন যা ধরব, তা-ই চাই!'

'সে তো এখনকার কথাই বলছ। এর জন্যে আড়াই হাজার বছর আগে যেতে হবে কেন?'—কুমারেশ হেসে বলল।

দু'জনে বারান্দায় দুটো চেয়ার টেনে বসেছিল। সামনে বিস্তৃত লন। ধারে

ধারে ফুলগাছ। সন্ধের ছায়ায় এখন সব আবছা হয়ে এসেছে। বুলা বলল —'ওই তো সেই জানলা, যেখান দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে এক দিন তোমায় দেখতে পেলাম। লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। কিছু একটা শয়তানি করেছিলে, বুঝলে? তোমাকে তখনকার পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল'।

বুলা হেসে উঠল। কুমারেশ বলল, —'তখন পুলিশও ছিল?'

'ছিল বই কি, নইলে একটা রাজ্য চলে?'

—'তো তারপর?'

'তারপর আমি আবদার ধরলাম, তোমাকে আমার চাই। তখনও নিশ্চয়ই এখনকার মতো লালটুস দেখতে ছিলে। বাবা বলে-কয়ে জরিমানা দিয়ে তোমাকে রাজরোষ থেকে উদ্ধার করলেন। তারপর ঘটাপটা করে বিয়ে হল'।

—'তারপর?'

—'তারপর কাল শুনো। এখন ভীষণ খিদে আর ঘুম পাচ্ছে,' বুলা হাই তুলল একটা, মুখে হাত চাপা দিয়ে আলগা করে, চোখে জল এসে গেছে।

—'এরই মধ্যে ঘুম?'

—'বাঃ, কত হেঁটেছি, কত পাহাড় চড়েছি বলো তো? ব্রহ্মাকুণ্ড দেখে পুরো জরাসন্ধ্ কা বৈঠক পর্যন্ত উঠে গেলাম। আর সপ্তপর্ণী গুহা তো তারপর ঘুরে, আবার নেমে যেতে হয়। তুমি তো গেলেই না!'

—'তোমাকেই বা কে যেতে বলছিল?'

—'বাঃ, প্রথম বৌদ্ধধর্মসঙ্গীতির অকুস্থল! দেখব না? জানো তো ত্রিপিটক ওইখানেই প্রথম সংকলিত হয়! বিনয় পিটকের এডিটর ছিলেন একজন নাপিত, তাঁর নাম উপালি। ভাবতে পারছ?'

—'উঃ, তুমি তো দেখছি একেবারে ইতিহাসের দিদিমণি হয়ে গেলে?'

—'কবে যে জানতাম! ভুলেই গিয়েছিলাম। এখানে এসে মনে পড়ে যাচ্ছে,' —বুলা আবার হাই তুলল।

মাঝরাত্তিরে কুমারেশকে ডেকে তুলল বুলা,বলল —'মনে পড়েছে, ওই মেয়েটার নাম ভদ্রা, আর ওই লোকটার নাম সম্বুক।'

—'কোন মেয়ে?' কুমারেশ ঘুম চোখে জিজ্ঞেস করল।

—'ওই যে, যে মেয়েটা এখানে থাকত, আর যে লোকটাকে সে জানলা থেকে দেখল!' বলে বুলা আবার ধপাস করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

—যা বাব্বা। স্বপ্ন-টপ্ন দেখল না কী? কুমারেশ উঠে বারান্দার দিকে জানলা খুলে একটা সিগারেট ধরায়।

শৈলগিরি। গৃধ্রকূট যার শিখর। রোপওয়েতে করে দুলতে দুলতে পৌঁছে যাওয়া। চমৎকার দুপুরে জাপানি বুদ্ধমন্দির শান্তিস্তূপ। পৃথিবীর যাবতীয় কলুষ-কালির উপর বাটি উপুড় করে দিয়েছে কেউ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত জাপানের গড়া। শান্তিস্তূপ। বাইরেও অনুপম বুদ্ধমূর্তি। ভেতরেও। ধ্যানস্থ। তিনটি জাপ যুবক, একটি বাঙালি যুবতী নতজানু। বাঙালি? না মাগধী? বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বলছে না কি তোসিকো? 'ধম্মং শরণং গচ্ছামি, বলছে মগধিনী? ধর্মের শরণই আবার নেবে নাকি?

জাপানিরা স্তূপ প্রদক্ষিণ করতে গেল। মধ্যদিন পার হয়ে যায় যায়। ছায়া পড়ে যায় যায়। গৃধ্রকূট! গৃধ্রকূট। গৃধ্র চঞ্চু ক্ষয়ে গেছে কালের প্রকোপে। বাইরে থেকে চেনা যায় না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে বুঝি আজও সেই গৃধ্রকূট।

মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। ক্লান্ত শরীর জুড়িয়ে যায়। আজ অনেক ঘোরা হয়েছে। শুধু আজই বা কেন? এই ক'দিন? এ যাত্রায়। ফেরবার সময়ে রাঁচি, রাজরপ্পায় ছিন্নমস্তার মন্দির। বেড়াতে বেড়াতে দু'জনে রুক্ষ পাথরের উপর অদৃশ্য পায়ের ছাপে পা রেখে রেখে কিনারে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত রাজগৃহ নগরটা দিনান্তের রোদে ঝিমিয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে বিম্বিসারের কারুগৃহ, সোন-ভাণ্ডার, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটি প্রায় সমান্তরাল পথ নগরীর দৈর্ঘ্য ফিতে দিয়ে মাপছে।

বুলা হঠাৎ ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে 'আর কোথাও যাব না বুঝলে? এই রাজগৃহর স্মৃতি নিয়েই এবার ফিরব।'

—'সে আবার কী? টিকিট কাটা, বুকিং রয়েছে।'

—'তাতে কী? আমার আর ইচ্ছে করছে না।'

যতটুকু চিনেছে বুলাকে কুমারেশ জানে এই ওর শেষ কথা। ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে যদি না করে ভগবানের বাবার সাধ্য নেই, ওকে দিয়ে সে কাজ করায়। অতএব এই রাজগির, এই গৃধ্রকূট, এই-ই শেষ। নির্জন গিরিপ্রান্ত। গাছের আড়াল। কোথাও কেউ নেই। চোখে মোহ নিয়ে কুমারেশ ডাকে —'এসো, এসো বুলা। এসো।'

বুলা ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় কুমারেশের বুকে। পরক্ষণেই একটা আর্ত চিৎকার গিলে-নেয় গৃধ্রকূট। পাথরে ধাক্কা খেতে, খেতে, বাতাসে ওলট পালট হতে হতে নীচে পড়তে থাকে কুমারেশ। নীচে পড়তে থাকে।

বুলা তার ওড়না কোমরে গুঁজে নেয়। একবারও পেছন ফিরে তাকায় না। ও ভেবেছিল বুলা ওর বুকে ঝাঁপাতে গেলেই ও সরে যাবে। ও জানে না বুলা কত সতর্ক খেলোয়াড়। দিয়েছে একটা বিদ্যুৎগতিতে আপার কাট। এখন সে বুঝতে

পারছে উশ্রীতে যে বোল্ডারটার দিকে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল লোকটা, সেটা কত পেছল, কত গড়ানে, পা দিলে আর দেখতে হত না, সঙ্গে সঙ্গে হুড়াস, পাথর-ভর্তি উন্মাদ জলে, যেখানে সাঁতার-শিক্ষা কোনও কাজে লাগে না। এখন বুঝতে পারছে ট্রেন যখন হু হু করে ছুটছিল, তখন বারবার কেন খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল লোকটা। স্রেফ তাকে লোভ দেখাবার জন্যে। যাতে ওর দেখাদেখি সে-ও গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর সেই আকস্মিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

"চলন্ত ট্রেন থেকে দুঃসাহসিনী যাত্রিনীর পতন ও মৃত্যু।" তদন্ত কি আর হত না? হত। কিন্তু এ ক'মাসে বাবা-মার স্নেহ ও ভালবাসা ভালই আদায় করেছে লোকটা। না হলে বাবা বিশাল খরচ করে ল্যান্সডাউনের শো-রুমটা এত তাড়াতাড়ি....

আর সেই ফোন? দানাপুর জংশন থেকে শান্তিনিকেতনে বাবা-মাকে এস.টি.ডি?

বুলা বলছে.... 'চমৎকার আছি মা। দারুণ এনজয় করছি। একদম ভাববে না।'

তার হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে কুমারেশ —'চমৎকার ঠিকই। তবে মেয়েকে সামলাবার জন্যে আপনাদের আসা উচিত ছিল। ট্রেনের খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো চাই, উশ্রীর জলে কেউ চান করে না, ওর করা চাই-ই।'

মা বলছেন —'সে কী? বুলা বেপরোয়া সাহস ভাল না। কুমারেশের কথা শুনো।'

মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে গিয়েছিল। কোথায় বেসুর বাজছে, খচখচ করছে। প্রথমটায় সে বুঝতে পারেনি। ট্রেনের দরজায় ও তো দাঁড়ায় না, দাঁড়ায়নি। কুমারেশই তো দাঁড়ায়। সিগারেট মুখে নিয়ে, বেপরোয়া ভঙ্গিতে। তবে?

রাজগিরের মাটিতে পা দেবামাত্র বুলা বুঝতে পারে। ভদ্রা, ভদ্রাই ওকে বলে দেয়। আড়াই হাজার বছর বয়সের এক সুন্দরী তরুণী, ভদ্রা। মগধ রাজ্যের কোষাধ্যক্ষের একমাত্র আদুরে-আবদেরে মেয়ে। সে এক সুন্দর চোরের মোহে পড়ে। বাবা-মার সম্মতি আদায় করে বিয়েও করে। সবই দিয়েছিল তাকে— সুন্দর বরতনু, গরবিনী মন, সু-উচ্চ উদার হৃদয়। কত সেবা, কত বিলাস, সৎ সুন্দর জীবনযাপনের কত আয়োজন। কিন্তু জাতচোরের স্বভাব যাবে কোথায়? একদিন পুজোর ছলে ভদ্রাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার সমস্ত অলংকারে মুড়ে নিয়ে সম্বুক চড়ল গৃধ্রকূটে। তার পর বলে কি না—'সব অলংকার খুলে দাও, অলংকারের জন্যই তোমায় বিবাহ করেছি।' ভদ্রা তীক্ষ্ণধী মেয়ে। বুকে ছিল শুধু

অলংকার নিয়েই ক্ষান্ত হবে না দুর্বৃত্ত। তাকে হত্যা করবে। তাই সে অশ্রুমুখী সেজে শেষবার সালংকার আলিঙ্গনের প্রার্থনা জানায়, আর সেই ছুতোয় দুর্বৃত্তকে ঠেলে ফেলে দেয়।

গল্পটা কেমন করে যে তার জানা ছিল, কোথায় যে পড়েছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না বুলা। এখন, এই মুহূর্তে তো নয়ই। এখন বুক কাঁপছে। ভীষণ দুঃখ। ভীষণতর হতাশা, ভীষণতম ভয়।

কিন্তু না, সে ভদ্রার থেকে আড়াই হাজার বছরের ছোট হলেও আসলে তো আড়াই হাজার বছরের বড়ই। তখন ভদ্রা নিশ্চয় রাজদ্বারে সুবিচার পেয়েছিল। বিম্বিসার ধরতে পেরেছিলেন, পারতেন, কে প্রকৃত অপরাধী, কে নয়। এখন সে রাজদ্বার নেই, সে বিচারক নেই। নেই সে জনগণ। এখন চলবে দিনের পর দিন খবরে-কাগজে বিচার। স্টোরির খোঁজে পাপারাৎজি গল্পের মধ্যে গল্প খুঁজবে, উদ্দেশ্যর মধ্যে উদ্দেশ্য। জনগণ হয়তো চেঁচাবে—'মৃত্যুদণ্ড চাই, পতিঘাতিনীর মৃত্যুদণ্ড চাই!!'

আলুথালু বসনে চিৎকার করতে করতে ছুটতে থাকে বুলা শান্তিস্তূপের উদ্দেশে যেখানে তোসিকো আর তার দুই বন্ধু পরম শ্রদ্ধাভরে স্তূপ প্রদক্ষিণ করছে। আছড়ে পড়ে সে পাথুরে জমিতে।

'হোয়াত রঙ? হোয়াত রঙ?' —চকিতে তিন জাপ যুবক ঘুরে দাঁড়ায়। খসা টালি যত্ন করে বসাচ্ছিল জাপ কারিগর। ভেতরে ছিল মন্দিররক্ষক জাপ কর্মচারীকুল। সব বৌদ্ধ। ছুটে আসে। সংখ্যায় খুব বেশি নয়, কিন্তু যথেষ্ট।

—'আমার স্বামী পাহাড়ের ওপর থেকে পা ফসকে পড়ে গেছেন। ফর লর্ড বুদ্ধ'জ সেক সেভ হিম। বাঁচান, বাঁচান ওকে।

ছুটোছুটি পড়ে যায়। আতঙ্কিত ছুটোছুটি। সান্ত্বনাহীন কান্না কাঁদতে থাকে ভদ্রা।

আড়াই হাজার বছরেও লোকটার স্বভাব শোধরাল না?

একটা ছোট মেয়ে

লোকে বলে আমি একটা ছোট মেয়ে। 'এ তো বাচ্চা।' এইভাবে বলে। কিন্তু আমি জানি আমি মোটেই বাচ্চা-টাচ্চা নই। বারো ক্লাসে উঠলুম। সতেরো বছর বয়স হল—আবার বাচ্চা কী? আসলে আমি বেঁটে, চার ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি মোটে হাইট। মোটা-সোটা নই। তাই আমাকে ছোট লাগে। আমার বন্ধু দেবলীনার মা বলছিলেন --'হঠাৎ দেখলে তোকে লীনাদের থেকে অনেক ছোট দেখায়, কিন্তু মুখটা ভাল করে দেখলেই যে কেউ বুঝবে।'

দেবলীনা মজা পাওয়া হাসি হাসতে হাসতে বলেছিল —'তবে কি ঋতুর মুখটা পাকা-পাকা, মা?'

—'না, পাকা নয়, —ঢোক গিললেন দেবলীনার মা —'মানে ওই ম্যাচিওর আর কী!'

সেই মুখই এখন দেখছি আমি। গালগুলো ফুলো ফুলো। চোখ দুটো গোল মত। পাতা নেই। নেই মানে কম। ভুরু খুব পাতলা, ঠোঁটের ওপর দিকটা সামান্য উঁচু। হেসে দেখলুম দাঁতগুলো পরিষ্কার, ঝকঝকে, কিন্তু বাঁ দিকের ক্যানাইনটা উঁচু। একটু বড় বড়ও দাঁতগুলো। আমার চিবুকে একটা টোল আছে। আমার আর এক বন্ধু রুবিনা বলে —'তোর এই টোলটাই তোকে বাঁচাবে ঋতু।'

কেন একথা রুবিনা বলল, তার মানে কী, বুঝতে হলে আমার বন্ধুদের কোনও কোনও আলোচনার মধ্যে ঢুকতে হবে।

ভুরু প্লাক করা নিয়ে কথা হচ্ছিল একদিন। দেবলীনার ভুরু খুব সরু, বাঁকানো। বৈশালী বলল —'এরকম ভুরু আজকাল আউট অব ফ্যাশন।'

রুবিনা বলল —'না থাকলে করবেটা কী? যা আছে তার মধ্যেই তো শেপ

আনতে হবে। এই যেমন ঋতু। ভুরু বলে জিনিসই নেই, তার প্লাক।'

অমনি আলোচনাটা দেবলীনার থেকে আমার দিকে ঘুরে গেল। যেটাকে আমি ভয় করি। এবারে ওরা আমাকে নিয়ে পড়বে।

—'ঋতুর অ্যাট লিস্ট ব্রণর সমস্যা নেই।' বৈশালী বলল।

—'হ্যাঁ, কালো হলেও ওর স্কিনটা খারাপ না' —রুবিনা বলল।

—'এই ঋতু স্কিনের জন্যে কী করিস রে?'

আমি ক্ষীণ গলায় বললুম —'তুই কী করিস?'

—'আমি? আমার তো হাজার গণ্ডা ব্রণ, কোনও ক্রিম মাখার জো নেই। রেগুলার মুসুর ডাল বাটা আর চন্দন মাখতে হয়। বৈশালী কী করিস রে?'

—'আমার আবার মিক্সড স্কিন, জানিস তো। নাক চকচক করবে, কপাল চকচক করবে, আর গাল দুটো শুকিয়ে বাসি পাউরুটি হয়ে থাকবে। আমার অনেক জ্বালা। কোথাও ভাপ লাগে, কোথাও বরফ। কোথাও মধু, কোথাও চন্দন। সে অনেক ব্যাপার, মা জানে।'

—'তুই একটা মিস সামথিং না হয়েই যাস না।' দেবলীনা ক্ষ্যাপাল।

—'তবু মন খুলে মিস ইউনিভার্সটা বলতে পারলি না তো?' বৈশালী চোখ ছোট করে হাসছে।

—'মিস ইউনিভার্স হোস না হোস মিস সেন্ট অ্যানথনিজ তো তুই হয়েই আছিস।'

আমি বৈশালীর দিকে তাকালুম। শীতকালে ওর গাল দুটো একটু ফাটে। লালচে ছোপ পড়ে। এমনিতেই একটু লালচে ফরসা রং ওর। মুখটা এত মিষ্টি যে চোখ ফেরানো যায় না। লম্বা, দোহারা, ফুলহাতা লাল সোয়েটার আমাদের স্কুলের ইউনিফর্ম, পরেছে ব্লু স্কার্টের ওপর। ওকে দেখাচ্ছে যেন স্নোহোয়াইটের গল্প থেকে নেমে এসেছে। এখনও মিস সেন্ট অ্যানথনিজ অ্যাখ্যা ও পায়নি, কিন্তু টিচাররা ওকে আড়ালে 'ব্লাডি মেরি' বলে ডাকেন। ইতিহাসের ওই কুখ্যাত রানির নামে ওকে ডাকা হয় কেন আমরা ভেবে পেতুম না। দেবলীনাই জ্ঞান দিল। ওটা একটা ককটেলের নাম। ভোদকার সঙ্গে টোম্যাটো রস পাঞ্চ করে নাকি ব্লাডি মেরি হয়। দারুণ খেতে।

রুবিনা বলল, —'ঘাবড়াও মৎ ঋতু, তোর চিন-এর টোলটাই তোকে বাঁচাবে, মানে কাউকে ডোবাবে। ইটস ভেরি সেক্সি।'

আমি এখন আয়নার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখছি। মস্ত বড় আয়না। মাঝখানে একটা, দু-পাশে দুটো। তিনটে ছায়া পড়েছে আমার। ভুরু নেই, গোল

গোল চোখ, দাঁত উঁচু, বেবি ফেস, বেঁটে, কালো, সোজা সোজা চুল; সুদ্ধ-মাত্র চিবুকের টোল সম্বল। একটা গরম তরল কিছু উঠে আসে ভেতর থেকে। আমি শৌনককে চাই। কবে থেকে চাই। প্রেপ থেকে পড়ছি ওর সঙ্গে। ও আমার খাতা নিয়েছে, আমি ওর খাতা নিয়েছি। এক সঙ্গে বাড়ি ফিরেছি, ওর বাড়ি আমার একটু আগে। একটা বড় বড় ছায়াঘেরা গলিতে ওকে বেঁকে যেতে হয়। ওর ওপর যেন আমার একটা জন্মগত অধিকার জন্মে গেছে। কিন্তু ও সেটা বুঝলে তো? ও আমাদের স্কুলের সেরা অ্যাথলিট। ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। মিক্সড ডাবলসে ব্যাডমিন্টনে ওর পার্টনার দেবলীনা। শৌনকের চোখ কিন্তু সবসময়ে বৈশালীকে খোঁজে। এ সব আমি বুঝতে পারি। খেলাধুলোয় আমি নেই। একটু-আধটু টেবিল টেনিস খেলার চেষ্টা করি। ছোট থেকে নাচ শিখছি, ফুট-ওয়ার্ক ভাল হওয়া উচিত, কিন্তু রুবিনা আমার চেয়ে অনেক দ্রুত, অনেক চৌখস। নাচ শিখছি বলে যে স্কুল কনসার্টে হিরোইনের রোল পাই, তা-ও না। সেখানে বৈশালী আমার চেয়ে অনেক খারাপ নেচেও হিরোইন। আমি সখীদের দলে। বৈশালীকে খুঁটিনাটি স্টেপিং শেখাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফিরলে মা বলে —'কি রে শ্যামার রোলটা পেলি?'

—'না, মা। এই ফিগারে শ্যামা?'

—'সে কী? তবে? বজ্রসেন?'

—'কী যে বল মা, চার ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চিতে বজ্রসেন হয়?'

মা যেন এই প্রথম আমাকে দেখে। ভাল করে তাকায়। চোখের দৃষ্টিতে একটা বিস্ময়। যেন মা বলতে চাইছে —সত্যি? এই ফিগারে হয় না বুঝি? ও তোর হাইট কম বুঝি? তাই তো... তাই তো...

মায়েরা স্নেহান্ধ। নিজের মেয়েকে প্রত্যেকেই হয়ত অপ্সরী ভাবে।

—'অত ভাল করে ভরতনাট্যমটা শিখলি! কোনও কাজেই...' দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে মিলিয়ে যায় শেষ কথাগুলো।

মাকে আমি বুঝতে পারি। আমি একমাত্র মেয়ে, একমাত্র সন্তান। আমার একটা ভাই হয়েছিল। হয়েই মারা যায়। মা বাবা কেউই সেই শোক কাটাতে পারেনি। কেমন বিষণ্ণ, সব সময়ে যেন ভাবিত, মনের মধ্যে কী একটা ভার বইছে। আমাকে নিয়ে মা-বাবার অনেক আশা। ছোট্ট থেকে মা বাড়ির সব কাজ সামলে আমাকে নিয়ে সাঁতার, নাচ, ছবি-আঁকার স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে, আসছে। আমার একটু গা গরম হওয়ার জো নেই। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার, সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও মা ভীষণ সাবধান। ব্যালান্সড্ ডায়েট, ব্যালান্সড্ ডায়েট

করে দুজনেই পাগল। তা ছাড়াও আমাদের সব কিছু ছকে বাঁধা। মাসে একদিন মামার বাড়ি, দুমাসে একদিন জেঠুর বাড়ি, বছরে একবার বড় বেড়ানো, একবার ছোট বেড়ানো।

মাধ্যমিক পর্যন্ত বাবা-মা মোটামুটি আমার লেখাপড়া দেখিয়ে দিয়েছে। মাধ্যমিক পর্যন্ত আমি বেশ ভালও করেছি। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক থেকে আর কূল পাচ্ছি না। বাবা-মাও না। তিনজন টিউটর এখন আমার। নশো টাকা আমার টিউটরের পেছনে খরচ, নাচের স্কুলে দেড়শো, এখন স্পেশ্যাল কোচিং নিতে হয়। এ ছাড়াও আছে নাচের পোশাক, নাচের ট্রুপে এখানে-ওখানে যাওয়ার খরচ। আমার মা তো চাকরি করে না, বাবা একা। আমার একেক সময়ে খুব খারাপ লাগে। দেবলীনা বা বৈশালীদের মত আমরা ধনী তো নই! ওরা আমার বন্ধু বলেই বাবা-মা কয়েক বছর ধরে ভি সি আর, ওয়াশিং মেশিন কিনল, এবছর জন্মদিনে আমাকে একটা নতুন মিউজিক-সিস্টেম কিনে দিয়েছে। সি ডি প্লেয়ার পর্যন্ত আছে। জন্মদিনে বন্ধুরা এসে ওটা দেখে হুস হাস করছিল।

দেবলীনা বলল, —'ইস্‌স্‌ মাসি, আমি যে কেন ওনলি চাইল্ড হলাম না। দাদাটা সব মাটি করল।'

আমার মা হাসতে গিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, —'কত ভাগ্যে একটা দাদা পেয়েছ তা যদি জানতে। ঋতুটা বড্ডই একা।'

বৈশালী বলল, —'দাদা তবু স্ট্যান্ড করা যায়, কিন্তু দিদি?'

রুবিনা বলল, —'যা বলেছিস।'

শৌনক বৈশালীর দিকে চেয়ে বলল, —'যাক্ বাবা, দাদা স্ট্যান্ড করতে পারিস? তাহলে অন্তত তুই ফেমিনিস্ট নোস।'

জন্মদিনের উৎসবের শেষে কেমন মনমরা লাগল। মাকে বললাম, —'কেন যে এত দামী উপহার দাও!'

মা বলল, —'তোকে আরও কত দিতে আমাদের সাধ যায়!'

—আরও? মা, আর কত দেবে? আমি কী করে তোমাদের এতসব ফেরত দেব? মনে মনে বলি।

মা একটু দ্বিধা করে বলল, —'তুই যেন নিজেকে কারও থেকে ছোট, কারও থেকে কম না ভাবিস।'

কিন্তু মা ওয়াশিং মেশিন, ভি সি আর, মিউজিক সিস্টেম এই দিয়েই কি আমি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব? হতে পারব বৈশালীর মত সুন্দরী, দেবলীনার মত খেলোয়াড়, রুবিনার মত চৌখস, বিদিশার মত ব্রিলিয়ান্ট?

অনেক করে বাবা-মাকে বুঝিয়েছিলাম আমি সায়েন্স নেব না, অঙ্ক আমার বাঘ। খেটেখুটে মাধ্যমিকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট পেয়েছি বটে কিন্তু ভয় আমার ঘোচেনি। কেমিষ্ট্রি আমি মুখস্থ করতে পারি না, ফিজিক্স আমার মাথায় ঢোকে না, বায়োতে প্র্যাকটিক্যাল করতে আমার ঘেন্না করে। আমি বোঝালাম। বাবা বলল, 'তুই একটা স্টার পাওয়া মেয়ে। ফিজিক্স-কেমিষ্ট্রিতে লেটার পেলি, জিওগ্রাফি আর ম্যাথসে সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য লেটার মিস করেছিস। তুই সায়েন্স পারবি না? এটা কি একটা কথা হল?

মা বলল, —'তাহলে কি তোর ভাল লাগে না?'

—'ভালও লাগে না। কঠিনও লাগে মা, কেন বুঝতে চাইছ না?'

—'কিন্তু আমরা যে কবে থেকে ভেবে রেখেছি, তোকে এঞ্জিনিয়ার করব।'

বাবা বলল, —'জানিস তো, আমি হেলথ পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি বলে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারলাম না।'

মা স্বপ্ন-ভরা চোখে বলল, —'নিতু মাসিকে মনে আছে তোর? আমার মামাতো বোন? মনে আছে?'

—'হ্যাঁ। এখন তো কানাডায় থাকে।'

—'শুধু থাকে? কত বড় এঞ্জিনিয়ার, আমার সমবয়সী বোন, সে মন্ট্রিঅলে বসে বড় বড় মেশিনের ডিজাইন করছে। আর আমি? আমি বোকার মত সায়েন্স পড়লুম না, ফিলজফিতে দিগগজ হয়ে এখন দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছি।'

—'কিন্তু মা, সায়েন্স পড়লেই যে আমি জয়েন্ট পারব, পারলেও যে নিতু মাসির মত ব্রিলিয়ান্ট হব, তা কে বলল?'

—'কে বলতে পারে কে কী হবে?' মায়ের চোখ যেন শূন্যে স্বপ্নের পাহাড় দেখছে।

বাবা বলল, —'ঠিক আছে ঋতু, তোর যা ভাল লাগে পড়। আমরা কোন চাপ দেওয়ার ব্যাপারে নেই। তোর যা ইচ্ছে। তবে তুই যে মিথ্যে ভয় পাচ্ছিস এটা আমি তোকে বলতে পারি। ঠিক আছে ডিফিডেন্টলি কিছু করা ঠিক না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে চাপাচাপি আমি পছন্দ করি না।'

বলল বটে, কিন্তু বাবার মুখে কোনও আলো নেই। মার মুখ করুণ।

তা সে যাই হোক, একবার যখন বাবা-মা'র মৌখিক অনুমতি আদায় করতে পেরেছি আমি আর্টসই পড়ব। পাখির মত উড়ে যাচ্ছি। স্কুলে যাবার পথেই দেবলীনা, তারপর শৌনক। ওরা দুজনেই সায়েন্স। আমি আর্টস নিচ্ছি বলতে দুজনেই থেমে গেল। তারপর শৌনক বলল, —'ঋতু স্কুলে গিয়ে কাজ নেই।

তুই ডাক্তারের কাছে যা, ওই যে ডাক্তার কাঞ্জিলাল।'

—'দূর ওঁর কাছে গিয়ে কী করব? উনি তো....'

—'পাগলের ডাক্তার, তা তুই কি ভেবেছিস তোর মাথাটা ঠিক আছে?'

দেবলীনা বলল, —'হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়ে তুই কী করবি? কেরিয়ার তো একটা তৈরি করতে হবে!'

এই সময়ে রুবিনা আর বিদিশা এসে আমাদের সঙ্গে মিশল। রীতেশ আর সৃঞ্জয়ও আসছে দেখলাম।

দেবলীনা বলল, —'শুনেছিস? ঋতু আর্টস নিয়ে পড়বে। হিস্ট্রি, লজিক, এডুকেশন, পল সায়েন্স....।'

বিদিশা বলল, —'কী ব্যাপার রে ঋতু? আমাদের এবার থেকে অ্যাভয়েড করতে চাইছিস, নাকি? 'আমার এ পথ/ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে?'

বিদিশাটার আসলে আমার ওপর একটু দুর্বলতা আছে। সব সময়ে আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকি। বা বলা যায় পেছনে পেছনে থাকি। বিদিশা ফার্স্ট গার্ল, সৃঞ্জয় সেকেন্ড, আমি থার্ড আসি, কখনও কখনও ফোর্থও এসে যাই। মাধ্যমিকে সেকেন্ড এসেছি। বিদিশাকে ছুঁতে পারিনি। আমাকে বিদিশা ওর সহচরী বলে মনে করে। ল্যাংবোট আর কি। আমি আশেপাশে থাকলে ওর প্রতিভাটা আরও খোলে। মাধ্যমিকে সেকেন্ড এসেও আমার মান বিশেষ বাড়েনি। বিদিশাই বলে, —'টেন্যাসিটি থাকলে কী না হয়? ঋতুকেই দ্যাখ না!'

—'ঋতুর মত দিনরাত বইয়ে মুখ গুঁজে থাকা আমার দ্বারা হবে না বাবা —দেবলীনা ঘোষণা করল। বেশি না খেটেও দেবলীনা স্টার পেয়েছে।

ফর্ম নিলাম। লিখতে যাচ্ছি, শৌনক একলাফে এগিয়ে এসে আমার হাতদুটো পিছমোড়া করে ফেলল। বিদিশা লিখল কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স। আমার দিকে তাকাল। —'ফোর্থ সাবজেক্ট কী নিবি বল, এইটা তোর পছন্দমত দেব।'

আমি বললাম, —'সাইকো'।

সই করতে হাত ব্যথা করছিল, এমন জোরে ধরেছিল শৌনক। সই করার আগে শৌনকের দিকে তাকালুম, বিদিশার দিকে তাকালুম, —'দায়িত্ব কিন্তু তোদের।'

—'ঠিক হ্যায় ভাই। কাঁধ চওড়া আছে।' শৌনক শ্রাগ করল।

মা-বাবা বলল, —'আমরা কিন্তু জোর করিনি ঋতু, নিজের ইচ্ছেয় সায়েন্স নিলি। ভাবিস না। টিউটর, বইপত্র, লাইব্রেরি যা লাগে সব বলবি হয়ে যাবে।'

সেই দৃশ্যটার কথা মনে করে আমার চোখ জ্বালা করছিল। আজ এইচ এস

শেষ হল। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমাদের চণ্ডীগড়, কুলু-মানালি বেড়াতে যাবার কথা। কিন্তু আমি কি উপভোগ করতে পারব কিছু? ম্যাথস আমার যাচ্ছেতাই হয়েছে। কেমিস্ট্রিতেও বোধহয় অনেক ভুল করেছি। এইচ এস যে এত টাফ হবে, আমি কেন আমার বন্ধুরাও বুঝতে পারেনি। কেউ খুশি না।

শৌনক বলল, —'আগে থেকেই তোদের গুডবাই জানিয়ে রাখছি।'

—'কেন, কোথায় যাচ্ছিস? স্টেট্স? টোয়েফল-এ বসলি নাকি?'

—'খেপেছিস?' শৌনক বলল, —'ড্রপ-আউট। স্কুল ড্রপ-আউট বলে একটা কথা আছে জানতাম। শৌনক বিশ্বাস কথাটা এবার রিয়্যালাইজ করতে চলেছে। বাবাকে বলেছি একটা ফোটোকপি মেশিন নিয়ে বসব। কোর্টের পাশে জায়গা দেখুক।'

বৈশালী বলল, —'ভ্যাট, তুই তো স্পোর্টস কোটাতেই যে কোনও জায়গায় পেয়ে যাবি। আমারই হবে মুশকিল।'

শৌনক শুকনো মুখ করে বলল, —'পাস কোর্সে বি-এসসি পড়ে কী হবে, বল?

সুমিত বলল, —'আগে থেকে অত ভেঙে পড়ার কী আছে? আমিও তো ফিজিক্সে গাড্ডু খাব মনে হচ্ছে। তো কী? জয়েন্ট তো আছে এখনও। এ বারে না হয় পরের বছর।'

শৌনক বলল, —'জয়েন্টে তো স্পোর্টস কোটা নেই।'

বৈশালী আঙুল চিবোচ্ছিল। বলল, —'ঋতু তুই কি জয়েন্টে বসছিস?'

—'বসতে তো হবেই। না হলে বাবার মুখ থেকে আলো নিবে যাবে। মায়ের চোখদুটো... না না সে আমি সহ্য করতে পারব না।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সরে এলুম। শুনতে পেলুম বিদিশা বলছে, —'ঋতুটার পরীক্ষা আসলে খুব ভাল হয়েছে। বুঝলি?'

ঠিক সতেরো দিন বাদে জয়েন্ট। শেষ হলেই মনে হল মায়ের গর্ভ থেকেই যেন পরীক্ষা দিতে দিতে আসছি। কবে যে নিবে-আসা দিনের আলোয় পড়িনি, রাত জেগে লেখা প্র্যাক্টিস করিনি, কবে যে টেনশন ছাড়া, প্যানিক ছাড়া দিন কাটিয়েছি, মনে করতে পারছি না। এত দিনে কি শেষ হল? জয়েন্টে যদি এসে যাই, তো চার বছর এঞ্জিনিয়ারিং, সে মেকানিক্যাল থেকে আর্কিটেকচার পর্যন্ত যেটা পাই। তারপর ওঁ শান্তি। সার্টিফিকেটটা মা-বাবাকে ধরিয়ে দিয়ে বলব —কী? খুশি তো? খুশি? আর কিছু না। কিছু পারব না। থিসিস না, বিদেশ না,

নিতু মাসি দীপু কাকারা নিজেদের মত থাক, আমিও আমার মত থাকব। একটা চাকরি তো পেয়ে যাবই। তারপর দুমদাম করে বড় হয়ে যাব। টিউটরদের মুখ আর দেখতে হবে না। নাচটাও ছেড়ে দেব। ধু-র ভাল্লাগে না। কী হবে আর?

আজ রেজাল্ট বেরোবে। জয়েন্টেরটা আগেই বেরিয়ে গেছে। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে আর ছিঁড়ল কোথায়? বিদিশা, শৌনক দুজনেরই কিন্তু হয়ে গেছে। এত দিন ছিল শৌনক-বৈশালী জুটি। এবার বোধহয় শৌনক-বিদিশা! দুজনেই ওরা বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং-এ যাচ্ছে।

এল সিক্সটিন আসছে। এই বাসটা পয়া। চড়ে পড়েছি। স্কুল স্টপে নামতেই সৃঞ্জয় একদিক দিয়ে দেবলীনা আরেক দিক দিয়ে যেন ছিটকে বেড়িয়ে গেল।

—'দেবলীনা! এই লীনা! কী রকম হল?'

দেবলীনা কাঁচুমাচু মুখ করে একটা বাসে উঠে পড়ল। লীনার কী ভাল হল না? সেকেন্ড ডিভিসন হয়ে গেল নাকি? সৃঞ্জয়ের দিকে তাকাই। কোথায় সৃঞ্জয়!

ভিড় ঠেলেঠুলে ঢুকতে থাকি। বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটই বাবা কি মা কি আর কাউকে সঙ্গে করে এনেছে। আমার মাও আসতে চেয়েছিল। কদিন মায়ের জ্বর হয়েছে। আমি বারণ করলাম। আজকে জাস্ট রেজাল্ট বেরোচ্ছে, আসল বাঘের খেলা মার্কশিটের দিনে। সে দিন মাকে আনব।

আমাদের নোটিস বোর্ডটা বড্ড উঁচুতে। তার ওপর কাঁচে আলো ঝলকাচ্ছে, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।

—'বলো, বলো তোমার রোলটা বলো, আমি দেখে দিচ্ছি।' বাবা-জাতীয় একজন বললেন।

—'এফ এইচ এ থ্রি টু সেভেন ওয়ান।'

—'এফ এইচ এ থ্রি টু কী বললে?'

—'সেভেন ওয়ান।'

—'সেভেন ওয়ান, ওয়ান, এই তো, সেভেন টু। নাঃ সেভেন ওয়ান তো নেই!'

—'সে কী? এফ এইচ এ থ্রি টু সেভেন ওয়ান! দেখুন না!'

—'আমি সরে যাচ্ছি, মাই গার্ল, তুমি নিজেই দেখো।'

আমার পায়ের তলাটা হঠাৎ সমুদ্রের বেলাভূমি হয়ে যাচ্ছে। বালি সরছে, বালি সরছে, আমার রোল নাম্বার নেই, নেই। সত্যিই নেই। এ কী? এরম হয় নাকি? এ রকম ঘটে? আমার....আমি....আমার ক্ষেত্রে ঘটছে এটা? ঋতুপর্ণা মজুমদার....আমার.... রোল নম্বর নেই?

আমার দুপাশ থেকে সমুদ্রের তীরে বালির মত ভিড় সরে যাচ্ছে। আমি ডান হাত বাড়িয়ে পথ করে নিচ্ছি। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সামনে চলেছি ঠিক। চোখে জল? না, না, জল নয়। কেমন একটা ধোঁয়াশা, যা এই সাতসকালে থাকার কথা নয়, বুকের মধ্যেটা কেমন স্তব্ধ। আমার হৃৎপিণ্ডটাও সৃঞ্জয় আর দেবলীনার মত ছিটকে সরে যাচ্ছে।

রাস্তা, রাস্তা....অনেক পরে খেয়াল হল আমি রাস্তা পার হচ্ছি। যন্ত্রের মত জেব্রা ক্রসিঙে এসে দাঁড়িয়েছি। যন্ত্রের মত পার হচ্ছি রাস্তা। আমি কোনদিকে যাচ্ছি? বুঝতে পারছি না। আমাদের গলিটা যেন কেমন? দূর, শরীর যখন আমায় এতদূর টেনে এনেছে বাকিটাও টেনে নিয়ে যাবে। প্রতিবর্ত ক্রিয়া না কি একটা বলে যেন! আমি ভাবব না। ভাবছি না তো! চলছি। চলছি শুধু। আমার হাতে এটা কী? ও এটাকে বোধহয় পার্স বলে। এর ভেতরে কী থাকে? টাকা-পয়সা। টাকা-পয়সা মানে কী? কত টাকায় কত পয়সা হয়! কত পয়সায় কত টাকা হয়?

আরে! এই বাড়িটাতো আমি চিনি। উঁচু বাড়ি। দশতলা বোধ হয়। তুমি দশ গুণতে জানো ঋতু, যে দশতলা বললে? আচ্ছা গুণে দেখি তো। লিফ্টে যাব না। আমি গুণতে গুণতে উঠব। সেই কারা যেন কী গুণতে গুণতে গিয়েছিল? দোলা, ছ পণ, হ্যাঁ হ্যাঁ দোলায় আছে ছ পণ কড়ি গুণতে গুণতে যাই।

আস্তে আস্তে উঠছি আমি। এইটাই কি আমার বাড়ি? না তো! এটা বোধহয় আমার বাড়ি না। কিন্তু এটাতে আমি আসি। রোজ আসি না। শনি-মঙ্গলবারে আসি। শনি মঙ্গলবার .... এসব কথার মানেই বা কী? এই তো পেতলের নেমপ্লেটঅলা দরজাটা। ওহ্, এটা সেই অঙ্ক-ফিজিক্সের স্যারের বাড়ি। এখখুনি দরজাটা খুলে যাবে, স্যার চশমা মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করবেন।....

আমি পড়ি কি মরি করে ওপরের দিকে ছুটতে থাকি। এতক্ষণ পরে আমার দেহে গতি এসেছে। ছুটতে ছুটতে আমি চলে যাই ছাদের শেষপ্রান্তে। তারপর নিজেকে ছুঁড়ে দি শূন্যের কোলে। হে শূন্য আমায় কোল দাও।

আর ঠিক সেই সময়ে যখন আর ফেরবার কোনও উপায়ই নেই, তখনই পৃথিবী তার সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দেয় মেয়েটির কাছে। জীবন উজাড় করে দেয় তার সমস্ত নিহিত মানে।

রোদ দেখে সে জীবনে যেন এই প্রথমবার। বুঝতে পারে রোদে এই সেঁকা হওয়া, উলটে পালটে ঘরবাড়ি গাছপালা গরুছাগল মানুষটানুষ সমেত.... এইটাই জরুরি ব্যাপার, পরীক্ষার ফলাফলটা নয়। গাছও দেখে সে। একটা গুলঞ্চ, তিনটে

বটল পাম। তার জ্ঞাতি এরা, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এদের সঙ্গে তার, তাদের পারস্পরিক টান। একশো ফুটের কাছাকাছি উচ্চতা থেকে পড়তে পড়তে তার হৃৎপিণ্ডে ফুসফুসে মাধ্যাকর্ষণ ও হাওয়ার অমানুষিক চাপ তবু সে উলটো দিকের এগারো তলা বিল্ডিঙের সাততলার আলসেয় বসা একজোড়া ঘুঘুর গলার চিকন ময়ূরকণ্ঠি রংটা পর্যন্ত দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈশালী বা শৌনক নয়, নিজেরই মুখের অনন্য সৌন্দর্য আর একবার আয়নায় দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সমস্তটাই ভগ্নমুহূর্তের একটা ঝলক। একটা বোধ শুধু। এমনই অলোকসামান্য এই বোধ যে এর জন্য জীবন দেওয়াই যায়। কিন্তু মুশকিল এই যে জীবনটা চলে গেলে বোধটারও আর কোনও মানে থাকে না।